কেউ কিছু বলতে পারে না

[জর্জ বার্নার্ড শ'র 'ইউ নেভার ক্যান টেল'-এর বাংলা রূপান্তর]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার নাটকের
দুইজন উৎফুল্ল ও উচ্ছ্বসিত গ্রহীতা
ডক্টর আনিসুজ্জামান ও
সিদ্দিকা জামানকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র

মিসেস রোকেয়া আহ্‌সান, মা
রিজিয়া খানম, কন্যা
কিসমাতুল আহ্‌সান, পুত্র
বিলকিস খানম, কন্যা
ইকরামুল ইয়াজদানী, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী
খোরশেদ হোসেন, দন্তচিকিৎসক
আসাদুল্লাহ্ চৌধুরী, সলিসিটর
সৈয়দ, ওয়েটার
ইকরামুল হক, ব্যারিস্টার
কম্পাউন্ডার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অঙ্ক

[কোনো দাঁতের ডাক্তারের বসবার ঘর। মোটামুটি জমকালো করেই সাজানো। দাঁত উপড়ানোর উঁচু চেয়ার, কাঁচের আলমারিতে ছুরি, সাঁড়াশি, তাকে সাদা পাথরের বাটি, ওষুধের শিশি, দেয়ালে পোকা খাওয়া দাঁতের ছবি, চেয়ারের ঠিক পেছনেই গ্যাস পাম্প ইত্যাদি।

ঘরের মধ্যে দুটি মানুষ। একজন যুবক ডাক্তার। অন্যজন অষ্টাদশী তন্বী রোগিণী। মেয়েটি সুন্দরী, সুঠাম এবং সুবেশী। পোশাকটা অবশ্য একটু অসাধারণ এবং অতিরিক্ত জমকালো। সিল্‌কের পাজামার ওপর পুরু রেশমের লতাপাতার কাজ করা জাপানি কোট, পায়ে মখমলের চটি। মুখের গড়ন অত মিষ্টি ও স্নিগ্ধ না হলে ঠিক বর্মী মেয়ে বলেই মনে হতো। মেয়েটির হাতে এখনো এক গ্লাস পানি—এই মাত্র ঢোক গিলে কী একটা যেন গিলে ফেলতে চাইছে।

আর ডাক্তারের মুখে চোখে সাফল্যের আত্মপ্রসাদ চকচক করছে। ঠোঁটের কোণে বিজয়ীর গর্বিত হাসি মেখে মেয়েটিকে ভ্রূ কুঁচকে লক্ষ করছে। ডাক্তার পুরুষ এবং পরিচ্ছন্ন। এমন একটা ছেলেমানুষী ভাব রয়েছে যে, দেখে মনে হয় না ব্যবসায়ে খুব মুনাফা করতে পারবে। তবে বুদ্ধির ছাপটা স্পষ্ট।]

মেয়ে : (গ্লাসটা ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে) শুকরিয়া।

ডাক্তার : আপনাকেও। কারণ এইটে আমারও প্রথম দাঁত।

মেয়ে : (আঁতকে উঠে) তার মানে? আমার দাঁত দিয়ে আপনার হাতে-খড়ি? আগে বলেননি কেন?

ডাক্তার : কারো না কারো দাঁত দিয়ে শুরু করতেই হতো। সব ডাক্তারকেই একদিন তা করতে হয়।

মেয়ে : হুম, সেটা রোগীর কাছ থেকে টাকা না নিয়ে করা হয়। হাত পাকাবার জন্য হাসপাতাল পড়ে রয়েছে। সেখানে বিনে পয়সায় চিকিৎসা হয়।

ডাক্তার : (হেসে) আপনি অনর্থক চটে যাচ্ছেন। হাসপাতালের অভিজ্ঞতা আমারও আছে। আমি বলছিলাম হাসপাতাল ছাড়ার পর পেশাদার ডাক্তার হিসাবে আপনার দাঁত দিয়েই আমার বউনি। তা দাঁত তোলবার আগে গ্যাস নিতে রাজি হলেন না কেন?

মেয়ে : তাতে পাঁচ টাকা বেশি লাগত। আগেই তা জানিয়ে দিতে ভোলেননি।

ডাক্তার : ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কী বলছেন! পাঁচটা টাকার জন্য আপনাকে অতটা কষ্ট পেতে হলো। আমি সত্যি লজ্জিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে : কেন ? আপনি তো ডাক্তার। মানুষকে কষ্ট দেওয়াই তো আপনার পেশা।

[ডাক্তার অবাক হয়ে বিদেশী পোশাকপরা এই অদ্ভুত মেয়েটিকে মিটমিট করে বারবার দেখে। মনে মনে হাসতে হাসতে হাত ধুয়ে শিশি-বোতল গোছাতে থাকে। মেয়েটি উঁচু চেয়ার থেকে নেমে জানালার কাছে দাঁড়ায়।)]

আপনার ঘরটা সত্যি চমৎকার। নদীর ওপারের গ্রাম পর্যন্ত এই জানালাটা দিয়ে দেখা যায়।

ডাক্তার : জি।

মেয়ে : এই গোটা বাড়িটাই আপনার নাকি ?

ডাক্তার : কী যে বলেন!

মেয়ে : আমারও তাই মনে হয়েছিল। (উঁচু চেয়ারটা দেখিয়ে) দাঁত ওপড়াবার কুর্সিটা—এটা তো আপনার ?

ডাক্তার : হ্যাঁ, ওটা আমার নিজস্ব। ধারে খরিদ।

মেয়ে : হুম। ঠিক যা ভেবেছিলাম। ঘর নিয়েছেন কদ্দিন হলো ?

ডাক্তার : দেড় মাস। আরো কিছু জিজ্ঞেস করার বাকি থাকে তো—

মেয়ে : এখানে আপনার কে কে রয়েছেন ?

ডাক্তার : বিয়েই হয়নি এখনো।

মেয়ে : সেটা আর বলে দিতে হবে না আপনাকে। এক নজরেই আঁচ করেছিলাম। মা-বাবা, ভাই-বোন, কে কে রয়েছেন তাঁদের কথা জানতে চেয়েছিলাম।

ডাক্তার : সঙ্গে কেউ নেই। তারা সব দেশের বাড়িতে।

মেয়ে : হুম। দেড় মাস হলো শুরু করেছেন। আমার দাঁতই প্রথম। পসার কী রকম বুঝতেই পাচ্ছি।

ডাক্তার : গোড়ার দিকে সবার একটু মন্দা যায়।

[আলমারি গুছিয়ে শব্দ করে পাল্লা বন্ধ করে]

মেয়ে : ভালো। (হাতের থলের মধ্যে হাত পড়ে) গ্যাস নিইনি। শুধু পাঁচ টাকা দিতে হবে, না ?

ডাক্তার : পাঁচ টাকা।

মেয়ে : আপনি কি সব কিছুর জন্যই পাঁচ টাকা আদায় করেন নাকি ?

ডাক্তার : জি।

মেয়ে : কেন, বলুন তো ?

ডাক্তার : ব্যবসার সুবিধে হয়। দরাদরির ঝামেলা কম।

মেয়ে : বেশ মজার নিয়ম তো আপনার। ধরুন, এই নিন আপনার ফি। কী রকম তাজা, কড়কড়ে নোটটা দেখেছেন ?—আপনার প্রথম রোজগার। যে যন্ত্রটা দিয়ে মানুষের দাঁত ছ্যাঁদা করেন সেটা দিয়েই এই নোটটা ফুটো করে ঘড়ির চেনের সঙ্গে বুকের কাছে লটকে রাখবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : শুকরিয়া।

চাকর : (ঘরে ঢুকে) মেম সাহেবের ভাই এসেছেন।

ডাক্তার : এখানে নিয়ে এসো। সব হয়ে গেছে।

[অবিকল মেয়েটির পুরুষ সংস্করণ—ভাই ঘরে ঢুকল। এক বয়সী যমজ ভাই। গায়ে জিন্স-আটা জ্যাকেট, পরনে কর্ডের প্যান্ট। কবজিতে চকচকে ঘড়ি। কথা, হাসি, শরীর আশ্চর্য রকম পরিণত। বয়সের ওজনে ওর সংযত ভাবটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয়।]

ভাই : দেরি করে ফেলেছি নাকি ?

মেয়ে : জি। কখন সব খতম হয়ে গেছে।

ভাই : খুব বেশি চেঁচামেচি করিসনি তো ?

মেয়ে : যদ্দুর পেরেছি। তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এ আমার ভাই—কিসমত, সংক্ষেপে কিসু। আর বাইরে পেতলের ফলকে যার নাম দেখে এসেছ, ইনিই সেই ডক্টর খোরশেদ হোসেন—[যখন ওরা পরস্পরকে ঝুঁকে আদাব দিচ্ছে, তখন গড়গড় করে] সবে মাত্র দেড় মাস। বিয়ে করেননি এখনো। ঘরে জিনিসপত্র যা দেখছ, সবই ভাড়া করা, কেবল ওই দাঁত ওপড়াবার কুর্সিটা ছাড়া। ওটা ধারে খরিদ করা। আমার দাঁত দিয়েই হাতেখড়ি এবং একটানে উপড়ে ফেলেছেন দারুণ নৈপুণ্যের সঙ্গে, আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন চমৎকার।

কিসু : ছিঃ বেনু। এরি মধ্যে এই অচেনা ভদ্রলোককে এত রকম প্রশ্ন করে ফেলেছ ?

বেনু : বা-রে! আমি কেন প্রশ্ন করতে যাব। উনি— নিজেই তো—

কিসু : শুনে আশ্বস্ত হলাম। [ডাক্তার] আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ ডাক্তার সাহেব। আমাদের ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না যেন। মুশকিল হয়েছে কি জানেন, বড় হয়ে বাংলাদেশে আমরা এই প্রথম এলাম। মা আমাদের সর্বক্ষণ সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও সব সময়ে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাওয়াতে বড্ড আনন্দ হচ্ছে। আজ বিকেলে আমাদের ওখানে চা খাবেন আপনি— দাওয়াত রইল।

[অপ্রত্যাশিত অন্তরঙ্গতার এই লম্ফগতির সঙ্গে তাল রাখবার চেষ্টায় ডাক্তার নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু বলবার আগেই ভাই-বোন তোড়ে কথা বলে যায়—]

বেনু : চমৎকার! কোনো কথা নয়, রাজি হয়ে যান ডাক্তার সাহেব।

কিসু : এখনো আমরা কোনো বাড়ি খুঁজে পাই নি। কাছেই হোটেল। হোটেল ম্যারাইন, দোতলায়, পাঁচ নম্বর সুইট।

বেনু : দেখুন না, মাকে কী রকম তাক লাগিয়ে দি। বলে কিনা এদেশের ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতেই পারব না। হুম। মাকে গিয়ে যখন বলব, এই দ্যাখো মা, একদিনেই কেমন এক জাতবাঙালি পাকড়াও করে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছি। তাও যেমন তেমন আদমি নয়, মানী ব্যক্তি, ডাক্তার, ডিগ্রিওয়ালা। মা যা অবাক হয়ে যাবে!

কিসু : কোনো কথা নয়। আপনি আসছেন তাহলে। কথা ঠিক থাকে যেন।

ডাক্তার : কোন কথা ? আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন এতক্ষণ ? আপনারা কে ? আপনাদের পরিচয় কী ? কারো দাওয়াত কবুল করার আগে এ রকম মামুলি দু-একটা খবর অন্তত আমার জানা দরকার।

বেনু : ফুঃ! দেড় মাসে রোগী জোটে একটা! আপনার কী দরকার অত কথায় ? কেউ খানা খেতে ডেকেছেন, খেয়ে চলে আসবেন। ব্যস চুকে গেল।

কিসু : না বেনু, তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। মানুষের মনকে আমি যতখানি জানি, তাতে ডক্টর হোসেনের এই কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক এবং আমি সাধ্যমত তার জবাব দেব। এ হলো বেনু। ভালো নাম বিলকিস বানু। আমার পুরো নাম কিসমাতুল আহসান। এসেছি বার্মা থেকে। তবে এখানকারই মূল বাসিন্দা। শরীফ খান্দান—

ডাক্তার : আহসান! কোন আহসান ?

বেনু : [হতাশায় ভেঙে পড়ে] ঠিক ধরেছেন।

ডাক্তার : মানে ? কী ঠিক ধরলাম ?

বেনু : আমরা বুঝেছি। আপনি ঠিক ধরেছেন। ভাইয়া, সব গেল— এখানেও এরি মধ্যে সব জানাজানি হয়ে গেছে। [উত্তেজিত হয়ে ডাক্তারকে] এই হয়েছে আমাদের কাল। যেখানে যাই আমাদের নিজেদের সত্তার কেউ কোনো দাম দেয় না। নামী লোকের সন্তান হওয়া কী যে যন্ত্রণা সে আপনি কী বুঝবেন!

ডাক্তার : মাফ করবেন। দেখুন, আমি যে ভদ্রলোকের কথা বলছিলাম, তিনি কিন্তু মোটেই এমন কিছু নামি ব্যক্তি নন। কমলাপুরের সৈয়দ বাড়ির মির্জা আহসান। আপনারা তাঁর ছেলে মেয়ে নাকি শুধু সেটাই জানতে চেয়েছিলাম।

বেনু : না। কেউ না।

কিসু : অত জোর দিয়ে বলো কেমন করে। হতেও তো পারি।

বেনু : ওহ ভুলে গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই, হতে তো পারিই। হয়তো হবেই বা।

ডাক্তার : কী বলছেন যা-তা। এটাও ঠিক করে জানেন নাকি ?

কিসু : কী করে জানব ?

বেনু : কোনো বুদ্ধিমান সন্তানেরই সে কথা—

কিসু : হু—শ্—ষ্—ষ্। বেনু! (তীব্র এই সংকেতে বেনু, সামলে নেয়। ডাক্তার চমকে ওঠে।) আমাদের আসল পরিচয় তাহলে শুনে রাখুন, ডক্টর। সদ্য বার্মা প্রত্যাগতা স্বনামধন্যা লেখিকা, বেগম রোকেয়া আহসান আমাদের মা। এখানে না হলেও বার্মায় তাঁর খ্যাতির জুড়ি নেই। এমন কোনো পরিবার নেই যেখানে তাঁর বই থরে থরে সাজানো না রয়েছে। 'বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা', এ হলো সেগুলোর সাধারণ নাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : প্রথম ভল্যুম, বিংশ শতাব্দীর রান্নাঘর।

কিসু : দ্বিতীয়, বিংশ শতাব্দীর আদর্শ।

বেনু : তৃতীয়, বিংশ শতাব্দীর বেশভূষা।

কিসু : চতুর্থ, বিংশ শতাব্দীর নীতিবোধ।

বেনু : পঞ্চম, বিংশ শতাব্দীর ছেলেমেয়ে।

কিসু : ষষ্ঠ, বিংশ শতাব্দীর মা-বাপ। অষ্টম, নবম, দশম ইত্যাদি ইত্যাদি।

বেনু : কাগজের মলাটে বাঁধাই প্রত্যেকটির মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

কিসু : আর বড় পরিবারের জন্য মজবুত করে টেকসই চামড়ার বাঁধাই-মূল্য পাঁচ টাকা। এখনো না কিনে থাকলে আজই অর্ডার দিন। মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, বুদ্ধি ও চরিত্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে।

বেনু : দোহাই আপনার, তাই বলে এখনই নয়, আমরা চলে গেলে পর পড়বেন।

কিসু : বেনু ঠিকই বলেছে। বুঝলেন না, আমরা আবার অনুন্নত মনই বেশি পছন্দ করি। মার বড় দুঃখ, অনেক চেষ্টা করেও আমাদের স্বভাব একটুও শোধরাতে পারেন নি।

ডাক্তার : হুম্।

বেনু : ভাইয়া, বুঝতে পারছ ? ডাক্তার আমাদের দলে। ইনিও সংশোধিত চরিত্র ভালোবাসেন না।

কিসু : চমৎকার! তাহলে তো আর দেরি করা চলে না। রিজিয়ার কথাও এঁকে এক্ষুণি জানিয়ে দিতে হয়। রিজিয়া হলো বিংশ শতাব্দীর যুগনারী, আমাদের বোন।

বেনু : প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টি।

কিসু : যেমন রূপসী তেমন বিদুষী।

বেনু : রেঙ্গুনের স্বপ্ন।

কিসু : রূপের রানি।

বেনু : (হঠাৎ) বাঃ একেবারে অতটা বলো না ভাইয়া। গায়ের রং অতকটা হলে তাকে ঠিক আর রানি বলা যায় না।

ডাক্তার : (মরিয়া) দেখুন, আমাকে দয়া করে একটা কথা বলতে দেবেন কি ?

কিসু : নিশ্চয়ই একশ'বার। যা খুশি বলতে চান বলে ফেলুন। আমরা চুপ করলাম।

বেনু : ছিঃ ছিঃ বড় লজ্জার কথা। ভদ্রলোককে এতক্ষণ একটা কথাও বলার সুযোগ দিইনি। দুঃখিত।

ডাক্তার : (মুরুব্বিয়ানা সুরে) দেখুন, আপনাদের বয়স-সুলভ চপলতাকে সংযত করে যদি একবার।

বেনু : (ঝাঁপিয়ে পড়ে) কী বলেন ? হুম্, আপনার বয়স কত এখন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসু : তা ত্রিশের ওপর হবে।

বেনু : অসম্ভব। পঁচিশের একচুলও ওপরে নয়।

কিসু : বাজে বকো না।

বেনু : (ডাক্তারকে) কিছু বলছেন না কেন? যা হয় একটা কিছু বলে ঝগড়াটা শেষ করে দিতে পারছেন না?

ডাক্তার : (এখনো হকচকিয়ে) মানে আমি আপনাদের—আমাকে—(হাল ছেড়ে দিয়ে) আমার বর্তমান বয়স উনত্রিশ।

কিসু : (বেনুকে) হলো তো। খামকা তর্ক করেছিলি।

বেনু : হু, যেন তোমারটাই কত ঠিক হয়েছে।

কিসু : (হঠাৎ বিবেক) এই যা, আমরাই কথা বলছি। সত্যি একেবারে জংলী স্বভাব হয়ে গেছে আমাদের।

বেনু : চুপ! (আঙুল দিয়ে নিজের ঠোঁট চেপে ধরে বসে পড়ে)

ডাক্তার : শুকরিয়া (দু'জনের সামনে একটা কুর্সি টেনে বেশ গুছিয়ে বসে। তারপর বেনুকে লক্ষ্য করে) এখানে এসে অবধি কোনো স্থানীয় পরিবারের সঙ্গে মিশেছেন এখনো? (ভাইবোন স্পষ্ট করে মাথা নাড়ে। মুখ খুব গম্ভীর।) কিছু মনে করবেন না, একেবারে খোলাখুলিই সব বলতে হচ্ছে। (ভাইবোন সোৎসাহে মাথা নাড়ে।) এখানে পোশাক-পরিচ্ছদ, স্বভাব-চরিত্র যতই আপত্তিকর হোক না কেন, কিছু এসে যায় না। আমাদের সমাজে সবচেয়ে দামি জিনিস হলো বংশ পরিচয়। খান্দানের ছাপ, পিতৃ-পরিচয় ছাড়া এ সমাজে প্রবেশ করার অন্য কোনো রাস্তা নেই। সে বাপ জিন্দাই হোক আর মরহুমই হোক। আপনাদের কথাবার্তা শুনে আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই অত্যাবশ্যক ছাড়পত্রটাই যেন কোথায় হারিয়ে ফেলেছেন। (ভাইবোন করুণভাবে মুখ নাড়ে) মাফ করবেন, এ সমাজে বাস করে আপনাদের দাওয়াত কবুল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। (ভাবখানা : ব্যস্ সব শেষ।)

কিসু : (দীর্ঘ নিঃশ্বাসসহ) চল্, বেনু। উঠি এবার তাহলে।

বেনু : বেশ, চল। আচ্ছা চলি আমরা (সম্পূর্ণ বৈরাগ্য নিয়ে ভাইবোন দরজা অবধি এগিয়ে গেছে।)

ডাক্তার : (অনুশোচনায় দগ্ধ) দেখুন, একটু দাঁড়ান। আপনারা এমনভাবে চলে গেলে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না। মনে হবে একটা জানোয়ারের মতো ব্যবহার করলাম।

বেনু : সেটা আপনার নিজের বিবেকের ব্যাপার।

ডাক্তার : (সব মুখোশ খুলে ফেলে, মরিয়া) আমার বিবেক! জাহান্নামে যাক আমার বিবেক। সব কথাই তাহলে খুলে বলছি। এর আগে আরো দু-বার ডাক্তারি করব বলে কাজে নেমেছিলাম। বিবেকের তাগিদে রোগীকে কোনোদিন ফাঁকি দিতে চাইনি। রোগী কী শুনতে ভালোবাসে তার পরোয়া না করে বরাবরই যেটা সত্য সেটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছি। কী লাভ হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে জানেন ? পসার খতম। মরিয়া হয়ে আবার নতুন করে আরম্ভ করেছি। এই আমার আখেরি মওকা। ঘর সাজাতেই শেষ পাই-পয়সা পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে। এক কড়িও এ পর্যন্ত ভাড়া দিইনি। রেস্টুরেন্টে এখনো বাকি চলে বলে দু'বেলা পেটে দানা পড়ে। বাড়িওয়ালা টাকার কুমির, কিন্তু বেশি দিন ভাড়া না পেলে চুপচাপ বসে থাকার পাত্র সে নয়। এদিকে আমার রোজগার দেড়মাসে পাঁচ টাকা। আমার মতো ট্যাকফাঁকা লোক যদি সমাজের দাগ কেটে দেয়া পথ থেকে একচুল নড়ে, তবে সমাজ অমনি গ্যাঁক করে টুটি টিপে ধরবে। ক্ষমা করবে না। আপনারাই বলুন এ রকম অবস্থায় পিতৃ-পরিচয়হীন কারো দাওয়াত কবুল করতে যদি কিছু ইতস্তত—

বেনু : নানার পরিচয় হলে কাজ চলে ? নানা কিন্তু ফার্সিতে মস্ত আলেম ছিলেন।

ডাক্তার : (দ্বীপে পরিত্যক্ত নাবিক দিগন্তে পালের রেখা দেখতে পেয়েছে) বলেন কী ? আপনার নানা আছেন!

বেনু : মাত্র একজন, ছিলেন।

ডাক্তার : এতক্ষণ সে কথা বলেননি কেন ? ফার্সিতে আলেম ? কোনো কথা আছে আর ? এক মিনিট। অপেক্ষা করুন। আমি এক্ষণি কাপড়টা বদলে আসছি।

[ভাইবোন অবাক]

কিসু : (বেশ ঝাঁঝ দিয়ে) ইস্। ভড়ং কত! যেন হাতির দাঁত তোলেন! রোজগার নেই এক পয়সা, অথচ ভাবখানা আমাদের দাওয়াত কবুল করে যেন আমাদেরই কৃতার্থ করেছেন। ক'দিন পরে যে আমাদের দৌলতে প্রথম পেটপুরে ভালো খাবার খেতে পাবেন সেটা যেন আমরা বুঝি নে।

[পা দিয়ে চেয়ারের পায়ে লাথি মারে]

বেনু : অসহ্য। আর সহ্য হয় না ভাইয়া। এ কী রকম আজব দেশ বল তো ? দেখা হতে না হতেই জানতে চায়— কার সন্তান ? বাপ কে ? কী পরিচয় ?

কিসু : উপায় যখন নেই আমাদেরও একটা বিহিত করতে হবে এর। আর লুকিয়ে রাখলে চলবে না। মাকে বলতে হবে, আমাদের বাবা কে ছিলেন ?

বেনু : কিংবা কে তিনি ? বেঁচেওতো থাকতে পারেন।

কিসু : না থাকলেই ভালো। হঠাৎ করে এতদিন পরে আবার একজন জীবন্ত বাবা পছন্দ নাও করতে পারি।

বেনু : তার কোনো মানে নেই। ধর, তিনি বেঁচে আছেন এবং বেশ মোটা টাকার মালিক, তাহলে।

কিসু : সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না। মানুষের চরিত্র আমি যতখানি জানি, টাকা থাকলে আমাদের মতো এমন চমৎকার একটা মিষ্টি পরিবারকে কোনো বাবাই দূরে ফেলে রাখতে পারতেন না। সে থাকগে, ভালো দিকটাই আশা করা যাক। যদিও বেঁচে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

[কম্পাউন্ডার প্রবেশ করে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্পাউন্ডার : দু'জন ভদ্রমহিলা আপনাদের খোঁজ করছেন। বোধহয় আপনাদের মা আর বোন হবেন।

[মা ও মেয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। মিসেস রোকেয়া আহসান ও রিজিয়া। মা শক্ত-সমর্থ দেহের মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা। পরনে পরিচ্ছন্ন সাদা শাড়ি, চোখে চশমা, শান্ত সৌম্য সুন্দর মুখাবয়ব; রিজিয়া দীর্ঘাঙ্গী, সুদেহী, উজ্জ্বল্যতন্বী। একটু ধারালো এবং ঝাঁঝালো। পরনে সাদা সিলক শার্ট, কালো ক্রেপের ট্রাউজার। পায়ে চামড়ার দড়ির সাদা গ্রিসিয়ান, কবজিতে সোনালি ব্যান্ডের জ্বলজ্বলে হাতঘড়ি। ঘরে ঢুকেই মা বেনুর দিকে এগিয়ে যায়। রিজিয়া জানালার দিকে, যেন কাউকে লক্ষ করেনি]

মা : এখন কেমন আছিস ? দাঁতের ব্যথাটা কমেছে ?

বেনু : একদম সেরে গেছে। দাঁতটা একেবারে উপড়ে ফেলেছে মা।

কিসু : এ দাঁতের ডাক্তার কিন্তু কাবেল লোক। বেশ নামডাক আছে। জান তো মা, বিকেলে আমাদের সঙ্গে চা খেতে রাজি করিয়েছি ওকে।

[সুট-টাই ছেড়ে ডাক্তার সদ্য ধোপভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ঘরে ঢোকেন। মানিয়েছে খুব। ঘরে ঢুকেন প্রায় ছুটতে ছুটতে। পাঞ্জাবির বুকের বোতাম তখন সবগুলো লাগানো হয়নি, ঘরে ঢুকেই থ' হয়ে যান। রিজিয়া নির্মম একাগ্রতার সঙ্গে তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের দিকে]

কিসু : এই যে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাকে ডক্টর। ইনি আমার মা। আর উনিই আমার বোন, রিজিয়া খানম।

[রিজিয়া মাথা একটু ঝোঁকায়। ডাক্তার কিন্তু একবার সেদিকে চোখ তুলেই অনেকক্ষণ পলক ফেলতে ভুলে যায়। সামলে নিতে গিয়ে আরও কেলেঙ্কারি করে ফেলে। পাঞ্জাবির খোলা বোতামটি তাড়াতাড়ি লাগাতে গিয়ে নিচেরটাও খুলে ফেলে। হেসে ফেলে বসে পড়ে। অর্থাৎ যাকে বলে প্রথম দৃষ্টিতেই আহত।]

মা : আপনার সাথে আলাপ হওয়াতে বড় খুশি হলাম। বিকেলে চা খেতে আসবেন শুনে আরও খুশি হয়েছি।

ডাক্তার : শুকরিয়া। মানে আপনাদের আপত্তি না থাকলে, ইয়ে মানে, আপনারা এত খুশি হয়ে দাওয়াত করেছেন আর আমি, ইয়ে—

[কম্পাউন্ডারের প্রবেশ]

কম্পাউন্ডার : বাড়িওয়ালা বলে পাঠিয়েছেন বেরিয়ে যাবার আগে নিশ্চয়ই যেন ওর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে যান।

ডাক্তার : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেসব পরে দেখা যাবে খন। বলে আসুন গে, চার-পাঁচজন রোগী নিয়ে এখন খুব ব্যস্ত, ফুরসত পেলে নিশ্চয়ই আসব। যান। (কিসমত ছাড়া বাকি সবাই একটু হকচকিয়ে যায়। কম্পাউন্ডারকে ডেকে) শুনুন। বলুন গিয়ে, যদি সময় করে উঠতে পারি, এক ফাঁকে গিয়ে ওকেও দেখে আসব। জরুরি কিছু হলে উনি এখানেও চলে আসতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্পাউন্ডার : জি, আচ্ছা। (চলে যায়)

মা : (চলে যাবার জন্য ওঠে) আপনাকে বোধহয় আমরা আটকে রাখছি। আমরা বরঞ্চ এখন—

ডাক্তার : কিছু না, কিছু না। ভুলেও সে রকম কিছু ভাববেন না। আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন। নইলে বড় লজ্জা পাব। দেখুন, ব্যাপার হয়েছে কি জানেন, আপনারা যতক্ষণ হাজির আছেন ততক্ষণ রক্ষে। আমাকে একা ফেলে চলে যাবেন না যেন। দেড় মাসের ভাড়া বাকি। এর মধ্যে আজই প্রথম রোগীর সাক্ষাৎ মিলেছে। অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। এই রকম ঘরভর্তি রোগীর সামনে বাড়িওয়ালার সঙ্গে মুলাকাত আমার পক্ষে লাভজনক হবে।

বেনু : (বিরক্ত) আপনি কোনো কাজের লোক নন। মার সামনে সব ফাঁস করে দিলেন ? আমি কোথায় আরো ভেবেছিলাম আপনাকে একজন গণ্যমান্য বলে চালিয়ে দিয়ে মা'র কাছ থেকে বাহাদুরি নেব! আপনি একেবারে বেরসিক।

মা : (গম্ভীরভাবে, বিচলিত) বেনু, বেনু। ছিঃ ছিঃ। অমন করে কাউকে কিছু বলতে আছে! (ডাক্তারকে) তুমি বাবা, কিছু মনে করো না। উড়নচণ্ডী ছেলেমেয়েগুলোকে কিছুতেই বশ করতে পারি নি।

ডাক্তার : কিছু না, কিছু না। সেজন্য আপনি কিছু ভাববেন না। এতক্ষণে আমার বেশ আদত হয়ে গেছে। বরঞ্চ কিছু যদি মনে না করেন, পাঁচ মিনিট আরো অপেক্ষা করুন, আমি এক ছুটে বাড়িওয়ালাকে একটা সেলাম ঠুকে চলে আসছি।

বেনু : বেশি দেরি করবেন না। ভয়ঙ্কর ক্ষিদে পেয়েছে।

মা : বেনু, ছিঃ মা।

ডাক্তার : (বেনুকে) যাব আর আসব।

[রিজিয়া এখনো এক দৃষ্টিতে ডাক্তারকে দেখছে। ডাক্তার দরজার কাছ থেকে সে চোখের দিকে একবার তাকায় ও থমকে যায়। সহজ হয়ে তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে চৌকাঠে একবার হোঁচট খায়। বিদায়টা হাস্যকরভাবে করুণ হয়ে ওঠে। সবাই লক্ষ করে।]

কিসু : (ডাক্তার সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হবার পর, বেনুকে) লক্ষ করেছিস তো ? (রিজিয়াকে) আপা, প্রথম নজরেই ও বেচারাও কুপোকাত। ক্রীতদাস আরেকটা বাড়ল। এটা বুঝি পনের নম্বর, না আপা ?

মা : আহ্ বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস কিসমত। ওরা কেউ শুনতে পাবে।

কিসু : তার কোনো ভয় নেই। (তারপর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবার জন্য পাকাপাকিভাবে তৈরি) দেখ মা, তোমার সঙ্গে আজ একটা চরম বোঝাপড়া দরকার। আমি আর বেনু এ নিয়ে অনেকদিন থেকেই আলোচনা করে আসছি। মানুষের মন যতখানি বুঝতে পেরেছি তা থেকে এটা আমরা সহজেই ধরতে পেরেছি যে, তুমি এখন পর্যন্ত এই সহজ প্রচণ্ড সত্যটাকে স্বীকার করতে পারছ না যে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : আমরা এখন আর কচি শিশু নই, বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে। বড় হয়েছি।

মা : হঠাৎ এ নালিশ কেন ?

কিসু : কারণ আমরা মনে করি, কতকগুলো বিশেষ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে তোমার আরো খোলাখুলি কথাবার্তা হওয়া উচিত। আমাদের ওপর এতটুকুও আস্থা তোমার নেই কেন ?

মা : কিসু, কী বলছ, খেয়াল রেখ। তোমাদের আমি এই শিখিয়েছি ? আমি বরাবরই মনে করি, পারিবারিক জীবনের রূপ দু'রকম হতে পারে। যে ধরনের পরিবার বুদ্ধি হওয়া অবধি তুমি চিনতে শিখেছ সেখানে একজন আরেকজনের ব্যক্তিগত জীবন বা চিন্তায় কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করে না। প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত। এই পারিবারিক জীবনের উলটো কদর্য রূপটা তুমি কোনোদিন দেখনি— যেখানে স্বামী স্ত্রীর চিঠি খুলে পড়ে, প্রতিটি মুহূর্ত আর প্রতিটি পয়সার হিসেব-নিকেশ স্ত্রীকে স্বামীর কাছে দাখিল করতে হয়, যেখানে মায়েরা পাল্টা জুলুম চালায় ছেলেমেয়েদের ওপর। ব্যক্তিগত জীবনের কোনো কিছুই সেখানে গোপনীয় নয়— স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, ধর্ম-নীতি সবই জুলুমের হাতিয়ার। ওহ কী করে বোঝাব আমি তোমাদের! (ক্লান্ত, নিঃশ্বাস নিতে থামলেন।)

বেনু : (নির্বিকার) দ্রষ্টব্য 'বিংশ শতাব্দীর পিতামাতা'। পরিচ্ছেদ-ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। কিন্তু মা, এড়াতে চেষ্টা করো না, আমরা যা বলছিলাম সে কথায় এস।

মা : (সস্নেহে) পাগলি মেয়ে। সব কিছুই হালকা করে দেখার কী অদ্ভুত ক্ষমতা তোমাদের! আমার কাছে যা চরমতম তিক্ততায় ভরা, সেটা তোমরা এত সহজে উড়িয়ে দিতে পারিস! (একটু গম্ভীর হয়ে, কিসুকে) কিছুই আমি এড়াতে চাইনি। কিন্তু তার আগে আমার একটা কথার জবাব দাও। কিসু, তোমার নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমি কোনোদিন কোনো রকম কৌতূহল প্রকাশ করেছি ? যদি না করে থাকি তাহলে তুমিও আমাকে সে সম্মান কেন দেখাবে না ?

কিসু : কারণ আজ আমরা যা জানতে চাই, সেটা কেবল তোমার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার নয়— সেটা আজ আমাদেরকেও স্পর্শ করেছে।

বেনু : তাছাড়া, কৌতূহল একবার জাগলে মিটিয়ে ফেলাই সবদিক থেকে স্বাস্থ্যকর। এও তোমারই শিক্ষা, মা!

মা : বুঝতে পেরেছি, তোমরা আমাকে প্রশ্ন না করে ছাড়বে না।

কিসু ও বেনু : আমরা জানতে চাই, সত্যি সত্যি আমাদের—

কিসু : বেনু! প্রশ্নটা কী তুই করবি না আমি করব ?

বেনু : থাক, থাক। বল। তুমিই বল।

কিসু : তাড়াহুড়ো শব্দ করবি না। প্রশ্নটা খুবই সাধারণ, মা। একটু আগে ঐ গজদন্তের কারিগরটা, মানে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : ছিঃ, কাকে কী বলছ কিসু।

কিসু : দাঁতাল ডাক্তার কথাটা আমার অপছন্দ। ঐ স্বর্ণগজদন্তের কারিগর আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিল, কমলাপুরের মীর্জা আহসান সাহেব আমাদের পিতা কিনা। তোমার শিক্ষায় দীক্ষিত আমরা। 'বিংশ শতাব্দীর নীতিবোধ বর্ণিত উপদেশ-অনুযায়ী অনাবশ্যক মিথ্যা কথাকে যথাসম্ভব বর্জন করবার সংকল্প নিয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম— আমরা ঠিক বলতে পারব না।

বেনু : না জানলে বলব কী করে!

কিসু : জবাব শুনেই মাড়ির মিস্ত্রি বেঁকে বসল। জানিয়ে দিল, এ রকম ক্ষেত্রে আমাদের দাওয়াত কবুল করা নাকি তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও গত দেড়মাসের মধ্যে একবারও কেক বিস্কুট শুঁকে দেখার ওর সুযোগ ঘটেছিল কিনা সন্দেহ। মানব জীবন সম্পর্কে যতদূর আমি জানি— তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদেরও একজন পিতা ছিলেন— এবং তুমিও তা জান।

মা : (বিচলিত, রক্তবর্ণ) কিসু, চুপ কর, চুপ কর। তোমাদের জীবনে তোমাদের বাবা কিছু নয়। এর বেশি কিছু জানতে চেও না।

[কিসু ও বেনু চুপ করে থাকে কিন্তু সন্তুষ্ট হয় না। হঠাৎ স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে ঘরের অন্য কোণ থেকে হঠাৎ]

রিজি : মা! জানার আমাদের অধিকার আছে।

মা : 'আমাদের' ? কাকে বলছ ?

রিজি : আমরা তিনজন— তোমার ছেলেমেয়ে।

মা : (আহত) তোমার মুখে 'আমরা' বলতে বরাবরই বোঝত আমাদের দু'জনকে-মা আর মেয়ে। এতটার জন্য আমি তৈরি ছিলাম না, রেজু।

কিসু : (বিচলিত) তোমাকে খামকা দুঃখ দিচ্ছি, মা। থাক, ছেড়ে দাও ওসব কথা। এসব কথায় তুমি কষ্ট পাবে ভাবিনি। যাক্‌গে। আমি কিছুই জানতে চাই না।

বেনু : লক্ষ্মীটি মা, তুমি মন খারাপ করো না। আমরা কেউ কিছু জানতে চাই না।

মা : তোরা আমায় বড় ভালোবাসিস, না ?

রিজি : আমি আমার অধিকারের ওপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি, মা। জানার অধিকার আমাদের আছে।

মা : (তিক্ত) জবাব না শুনে তুমি কিছুতেই ছাড়বে না ?

রিজি : তুমি কি চাও এ ব্যাপারে আমরা আমরণ অজ্ঞই থেকে যাই ?

বেনু : রেজু আপা, মাকে কেন খামকা কষ্ট দিচ্ছ ?

রিজি : দুর্বল হয়ে লাভ কী ? এ ভদ্রলোক কী রকম করলেন সে তো শুনতেই পেলে, মা। আমার বেলাতেও এই রকম ঘটেছে।

মা : কী বললে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : সব খুলে বল।

কিসু : তোমার আবার কী হলো!

রিজি : তেমন গুরুতর কিছু নয়। আমরা যে জাহাজে আসি তার ফার্স্ট ক্যাপটেনকে তোমরা দেখেছ ? সে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করছিল।

বেনু : হতে পারে না। সে আমার কাছে প্রস্তাব করেছিল।

মা : ফার্স্ট ক্যাপটেন ? তুমি কী জবাব দিলে! (শুধরে নেয়) ভুল হয়ে গেছে। ওকথা আমি জিজ্ঞেস করতে পারি না।

রিজি : নতুন জবাব আর কোত্থেকে দেব ? যে মেয়ে নিজের বাবার পরিচয় জানে না সে কারও প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে না। জাহাজের ক্যাপটেন হলেও নয়।

মা : তুমি নিশ্চয় গ্রহণ করতেও চাওনি!

রিজি : চাইনি। কিন্তু যদি চাইতাম তাহলে বা কী লাভ হতো!

কিসু : বেনু, এসব কথা তুইও ভেবেছিলি নাকি!

বেনু : মোটেই নয়। আমি বলে দিয়েছি যে আমি রাজি আছি।

রিজি : রাজি হয়ে গেলি!

মা : (চিৎকার করে) বেনু!

কিসু : মেয়েটা বলে কী!

বেনু : দেখতে এত বোকা বোকা দেখাচ্ছিল।

মা : এ তুমি কী করেছ বেনু? এ কথা বলতে গেলে কেন।

বেনু : মজা লাগছিল। আংটি বানাবে বলে আমার আঙুলের মাপ পর্যন্ত চেয়ে নিয়েছে। তোমাকে বললে তুমিও আমার মতো করতে।

মা : না, করতাম না। সত্যি বলতে কী, সে লোক আমার সঙ্গেও অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করেছে। আমি ওকে পরামর্শ দিই কমবয়সী মেয়েদের ওসব কথা শোনাতে, যারা শুনে হয়তো খুশিই হবে। লোকটা দেখছি আমার উপদেশ-পালনে বিলম্ব করে নি। আমি দুঃখিত রিজিয়া, যে, তুমি আমাকে দুর্বল মনে কর। তোমরা যা জানতে চাও তা আমি এখনো তোমাদের কাছে বলতে পারব না। তোমরা এখনো ছেলেমানুষ।

বেনু : সে-কী মা ? এত গ্রন্থ রচনার পর তোমার মুখেই এই বাণী ? তোমার বই থেকেই মুখস্থ বলছি মা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সন্তান যখন প্রশ্ন করা শুরু করবে, তখন তাকে কখনও এড়িয়ে যেও না। তার সকল প্রশ্নের জবাব দাও, সোজাসুজি সত্য জবাব দাও। দ্রষ্টব্য 'বিংশ শতাব্দীর মাতৃত্ব'।

কিসু : প্রথম পৃষ্ঠা—

বেনু : প্রথম পরিচ্ছেদ—

কিসু : প্রথম বাক্য—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : প্রশ্ন করবার বয়স তোমাদের হয়নি, এ কথা আমি বলি না; জানতে চাওয়ারও তোমাদের অধিকার আছে। কিন্তু তাকে গ্রহণ করার মতো পরিণতি এখনো তোমাদের আসেনি। লক্ষ্মীটি, তোমরা আমায় ভুল বুঝো না। এতখানি তিক্ত অভিজ্ঞতা পেরিয়ে এসেছি যে সমদুঃখী ছাড়া অন্য কাউকে আমি সে সব কথা শোনাতে পারব না, বোঝাতে পারব না।

কিসু : তার মানে কোনোদিন তুমি বলতে চাও না ?

রিজি : (একটু নরম) ইচ্ছে করে তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য কিছু বলিনি, মা।

মা : সে কি আর আমি বুঝি না পাগলি।

রিজি : (তবুও ছাড়ল না) কিন্তু তাই বলে আমাদের বাবা আমাদের কাছে কিছু নয়, এমন কথা তুমি বলতে পারলে!

মা : (কঠিন) তোমার বাবাকে একটুও মনে আছে তোমার ?

রিজি : আবছা আবছা। খুব সামান্য।

মা : পরিষ্কার করে মনে করতে পারছ না— না ?

রিজি : না।

মা : (দাঁত চেপে) যদি কোনোদিন আমি তোমাদেরকে মারি, বাজার থেকে শংকর মাছের চাবুক কিনে এনে মারতে মারতে তোমাদের চামড়ায় দাগ কেটে দি, তা হলে সেদিনের কথা আর সেদিনের আমাকে ভুলতে পারবে কখনো ? সময় থাকতে যদি তোমাদের সরিয়ে না নিতাম তাহলে তোমার বাবার ঐ রকম একটা মূর্তি চিরদিন মনে আঁকা থাকত। সেই জীবনের আওতার বাইরে এনে তোমাদের আমি এত বড় করেছি। তোমরা এখন আমার জীবনের গণ্ডির ভেতর। আরেকবার সে নাম ডেকে এনো না, উচ্চারণ করো না।

[সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়, ডাক্তার প্রবেশ করে]

ডাক্তার : আপনাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলাম। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কী জানেন, আমার এই বাড়িওয়ালাটা এক আজব বুড়ো।

বেনু : সত্যি ? সবটা গল্প বলুন! আপনার ভাড়া শোধ করবার সময় দিয়েছে তো ? কত দিনের ?

মা : আহ্ বেনু, ছিঃ! সব সময় প্রশ্ন কর কেন ?

বেনু : থাক, প্রশ্ন করব না আর। (ডাক্তারকে) বলুন আপনি।

ডাক্তার : প্রধান ঘটনা এই যে বাড়িভাড়া আমাকে এখন দিতেই হবে না। সেজন্য তিনি ডাকেনও নি। আসলে ওর নিজেরই একটি দাঁতের কোণ ভেঙে গেছে। কামড়ে ধরে আখরোট ভাঙছিলেন। উনি চান যে, আমি এ ভাঙা দাঁতটা একটু দেখে দিই। এখুনি। তারপর ওর সঙ্গে সঙ্গে কোনো বড় হোটেলে খেতে যাই।

বেনু : বাঃ চমৎকার! দাঁতটা উপড়ে ফেলে দিয়ে ওকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন না, সবাই মিলে এক সঙ্গে খাওয়া যাবে। (দরজার কাছে গিয়ে) কম্পাউন্ডার সাহেব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচে গিয়ে বুড়ো সাহেবকে এখানে চলে আসতে বলুন। (ভেতরে ঢুকে) ঐ যা, একটা কথা। বুড়ো লোক কেমন ? মানে এদেশের ভাষায়। অর্থাৎ— মা-বাবা, পিতৃপরিচয়, বংশ তালিকা, খান্দান, এগুলোতে বুড়োর কোনোরকম কেলেঙ্কারি নেই তো ?

ডাক্তার : নিশ্চয়ই না, আমাদের চেয়ে অনেক ভালো।

বেনু : তাহলে তো কথাই নেই। দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ? ছুটে গিয়ে নিয়ে আসুন না।

ডাক্তার : (মাকে আড়চোখে চেয়ে) মানে আপনাদের দেখে উনিও যে খুব খুশি হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই— আপনারা যদি সত্যি ওকে—

মা : নিশ্চয়ই। একশ'বার। ওকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। আমি খুব খুশি হব। তবে আমাকে এক্ষুণি উঠতে হচ্ছে, একটা জরুরি কাজ রয়েছে। হোটেলে আমার একজন পুরনো পরিচিত ভদ্রলোককে আসতে বলেছিলাম। আজ এই আঠার বছর বাদে প্রথম তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। দেরি করতে চাই না। চলি তাহলে।

ডাক্তার : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

রিজি : আমি সঙ্গে আসব ?

মা : না, না, কোনো দরকার নেই ! আমি ওর সঙ্গে একাই দেখা করতে চাই। আসি।

[আদাব বিনিময়। ডাক্তার মাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সঙ্গে বেরিয়ে যায়। দরজায় টোকা পড়ে]

রিজি : কে ?

কম্পাউন্ডার : (মাথা গলিয়ে) উনি এসে পড়েছেন।

রিজি : কে ?

কম্পাউন্ডার : মি. ইয়াজদানী (সরে যায়)

বেনু : কে ? পিয়াজদানী ?

কিসু : বাড়িওয়ালা বুড়ো ? চুপ্। সব এটেনশন। (গুছিয়ে ভদ্রভাব ফোটাতে চেষ্টা করে ফিস্ ফিস্ করে তাড়াতাড়ি) বুড়োকে পছন্দ হলে আমি বেনুকে ইশারা করব। বেনু যদি সমর্থন করে তবে সেও তোমাকে চোখ টিপবে। তখন কোনো দ্বিধা না করে বুড়োকে দাওয়াত করে বসবে; চুপ আসছে।

[বুড়ো বাড়িওয়ালাকে নিয়ে ঘরে ঢোকে ডাক্তার। বাড়িওয়ালার বয়স পঞ্চাশের উপরে। চামড়ায় কুঞ্চনের রেখা এখনো দেখা দেয়নি। চর্বি কিছু আছে। পোশাক সৌখিন। কথাবার্তায় একটু উচ্চ। দাড়িচুল একরোখা, সাদা। কোনো কারণে বুড়ো ডাক্তারকে স্নেহের চোখে দেখে, নইলে ডাক্তারকে পথে বসতে হতো অনেকদিন আগেই। ওপরে ওপরে না দেখলেও ভেতরে ভেতরে ডাক্তার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন। বুড়োর ধমক কিংবা গালি-গালাজের আমল দেয় না।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (বুড়োকে পরিচয় করিয়ে দেয়)—এরা তিনজন ভাইবোন। রিজিয়া খানম, কিসমাতুল আহসান আর বেনু। ইনি বাড়ির মালিক, আমার আশ্রয়দাতা, মি. ইকরামুল ইয়াজদানী। (বুড়োকে) এদের দেখা হয়ে গেছে। আপনি বসুন।

বেনু : এই উঁচু চেয়ারটায় বসুন আপনি। ওটাই সবচেয়ে আরামের।

বুড়ো : এরা সব দাঁড়িয়ে কেন ?

রিজি : আমরা এখন চলে যাচ্ছি। আপনি বসুন।

ডাক্তার : (বেশ ব্যস্ততার ভাব নিয়ে। এটা ওটা ঠিক করতে করতে) বসুন, আপনি বসছেন না কেন ? ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, একটু কাত হয়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিন।

বুড়ো : বেশ। তোমাদের চেয়ে বয়সে আমি অনেক বড়। আমিই ওটায় বসছি। (উঠে বসে!)

[ইশারায় তিনজোড়া চোখ পরস্পরকে সম্মতি জানায়।]

রিজি : আপনাকে একটা অনুরোধ করব, আশা করি, রাখবেন।

বুড়ো : বলো।

রিজি : আপনার ডক্টরকে আমাদের ওখানে আজ আমরা দাওয়াত করেছিলাম—কিন্তু আপনিও তাকে আটকে রাখতে চান বলে উনি একটু উভয়সংকটে পড়েছেন। তার চেয়ে যদি আপনিও আমাদের এখানে যেতে রাজি হন, তাহলে আমরা সবাই খুব খুশি হব। আমাদের মাও বড় আনন্দিত হবেন।

বুড়ো : (রিজিয়াকে দেখে নিয়ে) একশ'বার যাব।

রিজি : গুঞ্জন অনেক শুকরিয়া।

বেনু : করে কী যে খুশি হয়েছি।

কিসু : ওঠে ভাবতেও পারিনি এত সহজে সব হাসেল—

[থতমত খেয়ে তিনজনই এক সঙ্গে থেমে পড়ে। স্তব্ধতার অস্বস্তি কাটাবার জন্য বেনু ফট করে আরো বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল।]

বেনু : (বুড়োকে) আপনার বয়স কত ?

রিজি : (বাধা দিয়ে, ডাক্তারকে) আমরা চলি তাহলে এখন। কথা রইল বিকেলে আসছেন। ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আসতে ভুলে যাবেন না যেন।

[যেতে যেতে এগোয়]

ডাক্তার : সে ভয় নেই। (রিজিয়াকে দরজা খুলে দেয়। তারপর তাকে এগিয়ে দেবার জন্য ডাক্তার ও কিসু চলে যাবে।)

বেনু : (এতক্ষণে বুড়োর গা ঘেঁসে এসে পড়েছে) আমার পরামর্শ নিন, ভালো হবে। ডাক্তারকে বলবেন গ্যাস দিয়ে তারপর দাঁত ওঠাতে। কিছু, না, মাত্র পাঁচ টাকা বেশি লাগবে। তাতে কী এসে যায়, আপনার তো আর টাকার অভাব নেই, আরাম পাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো : (মজা পায়) তাই নাকি ? বেশ, বেটাকে তাই বলব। (বেনুকে ভালো করে দেখে) তুমি আমার বয়স জানতে চেয়েছিলে না! পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

বেনু : আমারও তাই মনে হয়েছিল।

বুড়ো : কেন চেহারা দেখেই বোঝা যায় নাকি ! (ভালো করে দেখছে বেনুকে।)

বেনু : আমার চেহারা কী দোষ করেছে ! ও রকম করে কী দেখছেন !

বুড়ো : তোমার সঙ্গে আর একজনের চেহারার আশ্চর্য মিল রয়েছে।

বেনু : কার মতো!

বুড়ো : অবিকল আমার মায়ের চেহারা।

বেনু : আমার চেহারা আপনার মার মতো ! কী যা তা বলছেন ! আপনার মেয়ের মতো বলুন।

বুড়ো : (গভীর ঘৃণায় মুখ কুঁচকে) কী বললে! আমার মেয়ে ? না আমার মেয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনি তোমাকে। দেখার প্রবৃত্তিও নেই।

বেনু : (দরদ দিয়ে) কী হলো! দাঁত খুব ব্যথা করছে নাকি!

বুড়ো : না, না। ও কিছু নয়, কিছু নয়। বুকের মধ্যে পুরনো দিন মোচড় দিয়ে উঠেছিল।

বেনু : দুটোরই এক চিকিৎসা। উপড়ে ফেলুন। 'Pluck from the memory a rooted sorrow'। সঙ্গে গ্যাস নিন, আরো ভালো। মাত্র পাঁচ টাকা বেশি লাগে।

বুড়ো : 'Pluck from the memory a rooted sorrow' হুম। শুধু দুঃখ হলে হয়তো শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতাম। কিন্তু আমার বেলায় তার চেয়ে বেশি। জখম না করে আঘাত ক্ষান্ত হয় নি। দুঃখ ভোলা যায়। কিন্তু ক্ষতের দাগ যায় না সে আমি চেষ্টা করলেও মুছে ফেলতে পারব না। ভুলতে চাইও না। (চুপ করে থাকে)

বেনু : (পরখ করে) আপনি যদি চুপ করে বসে থেকে কেবল ঐ সব কথাই ভাবেন, তাহলে আজকে খাবার টেবিলে কেউ আপনাকে ভালোবাসবে না।

কিসু : (সবার অলক্ষ্যে বেনুর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে) বুঝলেন দানী সাহেব, বেনু যা বলে তা অন্যের ভালোর জন্যই বলে। তবে সব কথা বুঝে সুঝে বলে না, এই যা। (বেনুকে) ব্যস, আর কোনো কথা নয়। এবার এস।

বেনু : (সুস্পষ্টরূপে শ্রবণযোগ্য নিম্নকণ্ঠে, কিসুকে) আমাকে বলেছে, ওর বয়স নাকি সাতান্ন আর আমি নাকি দেখতে অবিকল ওর মা'র মতো। বুড়ো কিন্তু নিজের মেয়েকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, আর বলেছে—

[ডাক্তার প্রবেশ করায় বেনুর মুখ বন্ধ হয়]

ডাক্তার : রিজিয়া বেগম চলে গেলেন।

কিসু : বেশ করেছেন। আপনি কিন্তু দেরি করবেন না। সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : দেখবেন, দানী সাহেবের সব দাঁত তুলে ফেলবেন না যেন। ভালো করে খেতে পারেন এ রকম কিছু অন্তত রেখে দেবেন। (বলতে বলতে বেরিয়ে যায়।)

[ডাক্তার দেয়ালের যন্ত্রপাতির আলমারি খোলে]

বুড়ো : হু। একেবারে বখে গেছে। ডাক্তার, এই হলো তোমাদের এ যুগের ছেলেমেয়ে। তোমাদের নয়া সৃষ্টি। ওর বয়সে আমার চালচলন যদি ও রকম হতো, তাহলে আব্বাজান শরীরের হাড় একটাও আস্ত রাখতেন না।

ডাক্তার : (হাতে ছুরি সাঁড়াশি তুলে নেয়। কপালের ওপর চকচকে চাকতি বাঁধে। আলো ঠিক করতে করতে) আচ্ছা ওদের ঐ বড় বোনটিকে কেমন মনে হয়েছে আপনার ?

বুড়ো : তোমাদের চোখে একটু আলাদা ঠেকেছে, না ?

ডাক্তার : (অসতর্ক আবেগে) ওর মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য জ্যোতি রয়েছে যা— (হঠাৎ সামলে নিয়ে ডাক্তারি শুরু করে) ওসব কথা যাক। আর একটু, আর একটু হা করুন তো! হুম! একটাকে একদম গুড়িয়ে নিয়েছেন। লোহার মতো মজবুত অমন সুন্দর ঝকঝকে দাঁতের সারিটা অনর্থক নষ্ট করে ফেললেন। আখরোট দাঁত দিয়ে ভাঙতে যান কেন ? (ডাক্তার সরে এসে যন্ত্রপাতি গুছোয়)

বুড়ো : বরাবরের অভ্যাস। দাঁত রয়েছে কী করতে ? দাঁত ঠিক রাখার উপায়ই হলো, তাকে দিয়ে হাতুড়ির কাজ করানো— আর রোজ সকালে বিকেলে সাবান দিয়ে ভালো করে কচলে সব দাঁত ধুয়ে ফেলা।

ডাক্তার : সাবান! আপনি সাবান দিয়ে দাঁত মাজেন ?

বুড়ো : নিশ্চয়ই। ছোটকাল থেকে তাই শেখানো হয়েছে, এবং তা করেও আসছি। ভালো কাপড়-কাঁচা সাবান চমৎকার জিনিস। জীবনে কোনোদিন দাঁতের কষ্টে ভুগিনি।

ডাক্তার : সাবান! নোংরা মনে হয় না ? ইচ্ছে হয় কী করে আপনার ?

বুড়ো : ছোটকাল থেকে দেখে আসছি, কোনো ভালো কাজই কখনো করতে ইচ্ছে হয় না। জোর করে করিয়েছে প্রথম, পরে আমারও সয়ে গেছে। এখন মোটেই খারাপ লাগে না। বরঞ্চ সাবান টাট্‌কা হলে জিভ দিয়ে চাটতে ভালোই লাগে।

ডাক্তার : (চোখে-মুখে নাড়ি ওল্টানো ভাব) বাব্বা! আপনার ছোটকাল ভালো কড়া শাসনে কেটেছে।

বুড়ো : আমাদের মুরুব্বিরা আজকালকার মতো আদরে আদরে ছেলেমেয়েদের মাথা খেত না।

ডাক্তার : (মুচকি হেসে) বেশি আদর পেলেই ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যায় নাকি ?

বুড়ো : কোনো ব্যতিক্রম নেই তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : আপনার দাঁত আশ্চর্য রকম সুস্থ, এটা স্বীকার করেও আমি উল্টোটা প্রমাণ করতে পারি। অতি আদরে পুষ্ট এমন অনেকে আছেন যাদের দাঁতও আপনার সঙ্গে তুলনীয়।

বুড়ো : দাঁতই সব নয়। চরিত্রের উপর তার কী আছর হয়েছে বলো।

ডাক্তার : ও। হুম্। দেখি, আর একটু হা করুন দেখি। আরো। আরো। হুম। এত জোরে কামড়াতে গেলেন কেন ? আখরোটের চেয়ে দাঁতটাকেই বেশি ভেঙেছেন। সবটা তুলে ফেলতে হবে। ঘষে মেজে রাখা চলবে না। (যন্ত্রপাতি ঠিক করে) ভয় পাবেন না। কোনোরকম ব্যথাই দেব না আপনাকে। একটানে তুলে ফেলব। টেরও পাবেন না আপনি। এক মিনিট। গ্যাসটা একটু ঠিক করেনি।

বুড়ো : বাজে বকো না। গ্যাস কেন ? গ্যাস দিয়ে কী হবে ? হটাও এসব। আমাদের বাপ-মা দুঃখ সহ্য করার মতো শিক্ষা দিয়ে বড় করেছিলেন আমাদের।

ডাক্তার : যেমন খুশি আপনার। আমার কী ? শরীরে একটু বেশি কষ্ট পেলে আপনার চরিত্রের ওপর যদি আছর আরো ভালো হয়, তবে আমার কী ? যত চান কষ্ট দিয়ে দাঁত তুলছি। বাড়তি এক পয়সাও চার্জ করব না।

বুড়ো : (খোঁচা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে) খুব বাঁকাবাঁকা কথা বলছ, না ? দেড় মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে, ভুলে গেছ ?

ডাক্তার : না।

বুড়ো : এই মুহূর্তে যদি সে ভাড়া দাবি করি, দেবার ক্ষমতা আছে তোমার ?

ডাক্তার : জি না।

বুড়ো : বেশ। মনে থাকে যেন। (খুশি হয়) তাড়াতাড়ি বাকি শোধ করার ক্ষমতা না থাকলে কথার ধরন-ধারণ বদলে ফেলো। রোগীকে খামকা চটিও না।

ডাক্তার : তাতে আমার ক্ষতি হয় না। আমার সব রোগীর নৈতিক চরিত্র সাবান-কাঁচা দাঁতের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

বুড়ো : (উত্তেজিত) সেটা তাদের দুর্ভাগ্য। আমার চরিত্রের খুবী বোঝবার মতো আক্কেল তোমাদের এখনো হয়নি। খাওয়া-দাওয়ার খুব অসুবিধা না হলে, একটা একটা করে তোমাকে সব দাঁত উপড়ে ফেলে দিতে দিতাম। একটা টু শব্দও করতাম না। দেখিয়ে দিতাম, সেকালের শিক্ষায় মানুষ আমরা কত হাসিমুখে কষ্ট সহ্য করতে পারি। হুম।

ডাক্তার : আপনার তাহলে ইচ্ছে, আমি আরও নির্মমভাবে কাজ করি ?

বুড়ো : হ্যাঁ, তাই কর।

ডাক্তার : বেশ তাই হবে। বাড়িওয়ালা হিসেবে আপনি নির্মম হতে পারলে, ডাক্তার হয়ে আমি পারব না কেন ? (বুড়ো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। কম্পাউন্ডার ঘরে ঢুকে পাত্রে গরম পানি রেখে যায়) আচ্ছা, আপনি বিয়ে করেন নি কেন ? স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সংস্পর্শে এলে আপনার চরিত্রের এই নির্মম পবিত্রতা, আর কিছু না হোক, একটু নমনীয় হয়ে উঠত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো : (গর্জন করে) নিজের চরকায় তেল দাও।

ডাক্তার : (নির্বিকার চিত্তে কাজ করতে করতে) সেটা করতে যাচ্ছি বলেই কথাটা তুললাম। ভাবছিলাম বিয়ে করলে কেমন হয় ?

বুড়ো : ভাববে না কেন ? একশ'বার ভাববে। ভাববার তো সময়ই হয়েছে। ট্যাক ফাঁকা, রোজগার বন্ধ, বাড়ি ভাড়া বাকি, ঘরের জিনিসপত্র পর্যন্ত হয়তো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে লোকজন এসে সরিয়ে নিয়ে যাবে, তরুণ রক্ত, বিয়ের কথা এখন না ভাবলে আর কখন ভাববে ? এই রকমটাই হয়। কর, বিয়ে কর এবং মর।

ডাক্তার : শেষটায় দাম্পত্য জীবন সম্পর্কেও আপনার কথা বিশ্বাস করতে বলছেন নাকি ?

বুড়ো : কেন করবে না ? আমি বিয়ে করি নি, তুমি জানলে কী করে ?

ডাক্তার : মানে ?

বুড়ো : বৌ আমারও আছে। জাহান্নামে যাক সে। তার কথা আমার সামনে উচ্চারণ করবে না।

ডাক্তার : শুধু বৌ। সন্তান ?

বুড়ো : তিনটে।

ডাক্তার : তাদেরও জাহান্নামে পাঠাতে চান নাকি ?

বুড়ো : (বিচলিত) কেন। কোন দুঃখে। তারা তাদের মায়ের ছেলেমেয়ে বলে কি আমার কেউ নয়।

ডাক্তার : (গরম পানি থেকে যন্ত্র তুলে) আপনার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।

বুড়ো : তা হবার উপায় নেই। এবং রীতিমতো আনন্দের সঙ্গে এও তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে তারা এখন কোথায় কেমন আছে তার কোনো খোঁজ আমি রাখি না। জানি না। আর যতদিন ওরা আমার পথ না মাড়াবে ততদিন সে খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি না। (ডাক্তার একটা সাঁড়াশি গরম করে পানিতে বারবার ডোবাবে এবং ওঠাবে) অত নক্‌শা করছ কেন। গরম ঠাণ্ডা কোনোটাতেই আমার কিছু এসে যায় না। তুমি চট করে যা করার শেষ করে ফেল। দেরি সহ্য হচ্ছে না।

[ডাক্তার নিচু হয়ে কুর্সির পাশের গ্যাস পাম্প ও সিলিন্ডার ঠিক করছে]

বুড়ো : ওটা কী হচ্ছে ?

ডাক্তার : কিছু না। হাতে জোর পাবার জন্য দু'একটা ঠ্যাকনা তৈরি করে নিচ্ছি! পা-টা স্থির রাখতে হবে তো।

বুড়ো : দেখ বাপু বকিও না আর আমাকে। চটপট দাঁতটা তুলে নিষ্কৃতি দাও।

[হেলান দিয়ে শুয়ে হাতল চেপে ধরে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : তৈরি হোন, তাহলে। আচ্ছা বাজি ধরবেন একটা। একদম একটুও ব্যথা না দিয়ে যদি আপনার দাঁতটা তুলে ফেলতে পারি, কী দেবেন তাহলে ?

[পা-টা তুলে গ্যাস পাম্পের ওপর রাখে]

বুড়ো : তোমার দেড় মাসের বাড়িভাড়া মাফ করে দেব। হুম! আমার সঙ্গে বাজি রেখে কেউ কোনোদিন জেতে নি।

ডাক্তার : সত্যি! রেডি ?

[হঠাৎ এক ধাক্কায় বুড়োকে আধশোয়া করে কুর্সিতে চেপে ধরে এবং অন্য হাতে চেয়ারের জোড় খুলে হাতল ঘুরিয়ে সেটাকে প্রায় বিছানার মতো লম্বা করে দেয়।]

বুড়ো : এই— কী করছ— মারবে নাকি— সাবধানে— আস্তে।

ডাক্তার : মারব কেন ? (হ্যাঁচকা টানে গ্যাস মুখোশ চেপে ধরে নাকে মুখে)। তবে আধমরা না করে উপায় নেই।

[কিছুক্ষণ নিষ্ফল চেষ্টা চলে। তারপর মি. একরামুল ইয়াজদানীর নিস্তেজ দেহটা আর নড়ে না। ডাক্তার গ্যাস মুখোশ সরিয়ে রাখে। দ্রুত ও নিপুণ হস্তে সাঁড়াশি আর ছুরি নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে অচেতন ব্যক্তির হা-করা মুখের ওপর এবং ঠিক তখনই নেমে আসবে।]

পর্দা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অঙ্ক

[হোটেল মেরিনের খোলা ছাদের এক দিক। একটা ছোট টেবিলের পাশে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক চা খাচ্ছেন, ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন, হাতের খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছেন। কাঁচা-পাকা চুল, গোঁফ, কালো স্যুট, সাদা শার্ট, গলায় কালো বো। চোখে পুরু চশমা, টেবিলের ওপরে টুপি। সব কিছুই বেশ দামি এবং খুব সযত্নে রক্ষিত। কাঁচা টাকা এবং সফল জীবনের সামাজিক ছাপ সুস্পষ্ট। পাশে আরেকটা বড় টেবিলে চায়ের সুসজ্জিত সরঞ্জাম অপেক্ষা করছে।]

আসাদ : (হাই তুলে) ওয়েটার!

ওয়েট : জি হুজুর! (সামনে এসে দাঁড়ায়)

আসাদ : তুমি ঠিক জান যে, উনি এখনই ফিরবেন ?

ওয়েট : ঠিক জানি হুজুর। চারটার সময় আপনার সঙ্গেই দেখা করবার কথা।

[ভদ্রলোক চোখ তুলে ওয়েটারকে একবার দেখেন। কারণ গলার আওয়াজেও যেন লোকটা যাদু মেখে রেখেছে। তাছাড়া ওর উচ্চারণ ও ভাষায় এমন একটা আত্মনিষ্ঠের মার্জিত ভাব রয়েছে যা অবাক না করে পারে না। অত্যন্ত মামুলি কথাও যেন ওর মুখে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।]

ওয়েট : চারটে বোধহয় এখনো বেজে যায়নি হুজুর, (ভেতরে দেয়াল ঘড়ি দেখে) তিনটে আটচল্লিশ। এখনি এসে পড়বেন নিশ্চয়ই।

আসাদ : চমৎকার জায়গা এটা। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।

ওয়েট : জি! বড় সুন্দর জায়গা। সবাই এখানে এসে খুব খুশি হন। এ স্যুটে যাঁরা এসেছেন ওরাও বড় চমৎকার মানুষ।

আসাদ : তোমার পছন্দ হয় তাদের ?

ওয়েট : অমন হাসিখুশি দিলদরিয়া মানুষকে ভালো না বাসে কে ? একটু অবশ্য, বেয়াদপী মাফ করবেন, নিয়মের বার। এ রকম বড় একটা নজরে পড়ে না। সবার সঙ্গেই এমন একটা খোলামেলা ভাব যে মনটা আপনা থেকেই জায়গা ছেড়ে দেয়। বিশেষ করে ঐ ভাই-বোনের জোড়।

আসাদ : কে, বেনু আর কিসমাত ?

ওয়েট : জি, তার মধ্যে বোনটি প্রথম দিনই আমাকে ডেকে বললেন, "দ্যাখো সৈয়দ, শুধু তোমার নাম-ডাক শুনেই আমরা এ হোটেলে উঠেছি।" আর ভাইটিও যখন-তখন বলেন যে আমাকে দেখলেই নাকি ওর নিজের বাবার কথা মনে পড়ে। (আসাদ শিউরে ওঠে) এবং সেজন্যই নাকি আমার উচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে ওর সঙ্গে আমি ছেলের মতো ব্যবহার করি। দেখুন তো কী মুশকিলের কথা। কিন্তু সত্যি কী দিল, কী হাসি। কী হামদরদি।

আসাদ : তোমাকে দেখে ওর বাপকে মনে পড়ে? (হেসে) চেহারা কি ঠিক এ রকম নাকি?

ওয়েট : কী যে বলেন হুজুর! ওদের কথা কি অত মিলিয়ে ধরতে আছে? ওঁরা বলেছেন মনের খেয়ালে, মিল থাকলে আর বোনের চোখে ধরা পড়ত না?

আসাদ : কেন, বেনু কিছুই বলেনি এ নিয়ে?

ওয়েট : একটুও না। বোনটির মনে হয় আমার চেহারা নাকি স্যার সৈয়দের মতো। ওরাও সেজন্যই আমাকে সৈয়দ বলে ডাকে। আমার আসল নাম তো আরফান। (বাইরে তাকিয়ে) এই যে বেগম সাহেবা আসছেন।

[মা ঢুকে পড়েছে]

মা : এই যে আরফান, মেহমান কিন্তু দু'জন আরো বেড়ে গেল। জায়গা করে দিও।

ওয়েট : এক্ষুণি ঠিক করে দিচ্ছি বেগম সাহেবা। (চলে যাবে)

[ভদ্রলোক উঠে এসে মাকে সালাম করা সত্ত্বেও মা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে]

আসাদ : তুমি সত্যি আমায় চিনতে পারছ না?

মা : (যেন বিশ্বাস হয় না) কে, আসাদ ভাই?

আসাদ : কেন বিশ্বাস হয় না?

মা : আসাদ ভাই! আসাদ ভাই! আপনার দাড়ি কোথায় গেল?

আসাদ : সলিসিটর দাড়িওয়ালা হলে লোকে যে ডাকতে চায় না।

মা : আর আপনার ঢিলে পাঞ্জাবি, কাশ্মিরি শাল, সেগুলো গেল কোথায়?

আসাদ : আঁটসাঁট, ছিমছাম পোশাক না হলে পসার জমে না।

মা : মজলিসে যাওয়াটাও বোধহয় এখন একদম ছেড়ে দিয়েছেন, না?

আসাদ : না, না। কেন হবে? ওদের সমিতির সব সভাতেই ওরা আমাকে এখনো ডাকে এবং আমিও যাই।

মা : আপনার কী হয়েছে বুঝতে পারছি। আপনি মান্য ব্যক্তি বনে গেছেন। অবিকল আর পাঁচজনের মতো।

আসাদ : তুমি কি এই আঠার বছরে একটুও বদলাওনি?

মা : একটুও না।

আসাদ : আগের মতামতে এখনো বিশ্বাস কর?

মা : এক চুল এদিক ওদিক হয়নি।

আসাদ : বল কী? বিবাহিত মেয়েরও স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্ত্বা আছে, আমরা সব বানরের বংশধর, স্টুয়ার্ট মিলের ওপর আর কথা নেই, চাঁদ সুলতানা, রানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবানী, বেগম রোকেয়া, এঁরাই নারী। মেয়েদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি চাই, ভোট চাই— এগুলোতে এখনো বিশ্বাস কর নাকি ? প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে এগুলো নিয়ে আজকালও বক্তৃতা করতে তৈরি আছ ?

মা : নিশ্চয়ই। সেদিন যা বিশ্বাস করতাম, আজও তাই করি। হাওয়া বুঝে মত বদলাই না আমি। এবং আমার মেয়ে রিজিয়াকেও আমি ঐ আদর্শেই গড়ে তুলেছি। মা যখন অক্ষম হয়ে পড়বে মেয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে অসম্পূর্ণ কাজকে। সেজন্যই বাংলাদেশে আবার ফিরে এসেছি। ভাবলাম, রিজিয়াকে যখন একদিন এই দেশের মাটিতেই কাজ শুরু করতে হবে— তখন বিদেশ বিভূঁইয়ে আর থাকা চলে না। দেশের লোক হয়তো আজো সোরগোল তুলে তাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইবে—যেমন তারা তার মাকে দিয়েছিল—কিন্তু রিজিয়াকে পারবে না। সে সবকিছুর জন্যই তৈরি হয়ে আজ এসেছে।

আসাদ : সোরগোল তুলবে ? কী বলছ ? ওগুলোকে কি আর এখনো আধুনিক চিন্তা বলা হয় নাকি ? রিজিয়ার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা যদি আর বেশি না এগিয়ে থাকে তবে টাইটেল-পাস মওলানারাও আজ-কাল ওকে শাদি করতে আপত্তি করবে না। মান্য ব্যক্তি সাজার লোভে মন থেকে আদর্শ মুছে ফেলেছি এই তো তোমার খোঁচা ? এটা ভুল ধারণা। আমার খেয়াল তো একটুও বদলায়নি। পঁচিশ বছর আগে যা ভাবতাম আমি আজও তাই ভাবি। ধর্মের বাহ্যিক আচারে আমি একটুও বিশ্বাস করি না এবং তা নিয়ে আমি কোনো লুকোচুরিও করি না। হার্বার্ট স্পেন্সারের শিষ্য আর ব্যক্তি স্বাধীনতার পূজারী সেদিন যেমন ছিলাম আজও তেমনি আছি। কিন্তু কেউ তো আর আমাদের বিরুদ্ধে আজকাল কোনো হৈচৈ করে না। বরঞ্চ কেমন যেন আমাদেরকে সহ্য করা হয়। এড়িয়ে যাওয়া হয়, অবজ্ঞা করা হয়। জানো না বোন, হালের নয়া বুলি হলো সোশ্যালিজম। এই সোশ্যালিজমের কাছে মাথা নিচু করিনি বলে ওরা আমাদেরকে বড় তাচ্ছিল্য করে, আমল দিতে চায় না।

মা : (আহত) ছিঃ ছিঃ সোশ্যালিজম!

আসাদ : জি, সোশ্যালিজম। যুগের ব্যাধি। এখানে দু'দিন বাইরে ঘুরুক, দেখবে তোমার ঐ সোনার মেয়ে রিজিয়াও সোশ্যালিজমের জন্য লড়াই করতে লেগে গেছে।

মা : অত অবুঝ হয়ে গেছে সবাই ? সোশ্যালিজম যে কত বড় একটা ধোঁকা, এ আমি যখন-তখন প্রমাণ করে দিতে পারি।

আসাদ : শুরুতে সে চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলাম। তাই তরুণদের মধ্যে আজ আমার একজন ভক্তও নেই। তাই বলছিলাম, যাই করতে চাও সাবধানে করবে। দুনিয়াটা বেজায় পাল্টে গেছে। অনর্থক প্রতিবাদ করে ছেলেমেয়েদেরও ছারখার করে দিও না যেন। যাক সে সব কথা। হঠাৎ আমার কেন তলব হলো সেটা শোনা যাক।

মা : কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া বুঝি আপনাকে স্মরণ করা যায় না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ : শুকরিয়া।

মা : একটা জরুরি কাজের জন্যও ডেকেছি।

আসাদ : যেমন ?

মা : আমার ছেলেমেয়েদের কাছে সব খোলাখুলি বুঝিয়ে বলার সময় হয়েছে। সে কাজটা আপনাকে করতে হবে। ওরা কিছুই জানে না। এতদিন পরে পাকাপাকিভাবে যখন এদেশে থাকব বলে উঠে এসেছি তখন এ ব্যাপারে ওদেরকে আর অজ্ঞ রাখা ঠিক হবে না। (গলার কাঁপুনি আর পুরোপুরি চাপা থাকে না) আসাদ ভাই, ওদেরকে বুঝিয়ে বলার দায়িত্বটুকু আপনাকেই নিতে হবে। আমি...

[বেনু, কিসমাত এবং পেছনে রিজিয়া ঝড়ের মতো ছুটে ঢোকে। কিসমাত প্রাণপণে ছুটে আসছিল, কিন্তু বেগটা অশোভন না হয়ে পড়ে সে চেষ্টা করার ফাঁকে বেনু বেপরোয়াভাবে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে, জড়িয়ে ধরে মায়ের গলা, চেয়ার টেবিল উল্টে যেতে যেতে বেঁচে যায়।]

বেনু : (হাঁপাচ্ছে) জান মা, সব ঠিক করে এসেছি। দাঁতের ডাক্তার আসছে। আর বুড়োকেও সঙ্গে নিয়ে আসছে।

মা : বেনু মা, ছিঃ দেখছ না সামনে একজন ভদ্রলোক রয়েছেন। আদাব দাও। মস্ত বড় এটর্নি, আসাদুল্লাহ চৌধুরী, আমার মুখে যার কথা শুনতে। আমাদের পরিবারের অনেক পুরনো বন্ধু।

বেনু : (ঝটকায় সালাম সেরে) ইনিই তিনি ? এম্মা! এ কী রকম দেখতে ? সেই লম্বা কোঁকড়া চুল কোথায় গেল মা ?

কিসু : আর সেই যে দাড়ির কথা এত বলতে ? আর এ কী পোশাক ? সর্বাঙ্গে কোথাও এতটুকু কবিতা নেই। তোমার এত বর্ণনা সব কি তাহলে বানানো ছিল নাকি মা ?

আসাদ : (টাল সামলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে) আঠার বছরে অনেক তুফান বয়ে গেছে এই শরীরের ওপর দিয়ে। চেহারাটা একটুও বদলাবে না ?

রিজিয়া : এতদিনে তবু আপনাকে চোখে দেখলাম। সত্যি আনন্দ হচ্ছে আমার।

আসাদ : এই বুঝি রিজিয়া। আর এই বেয়াড়া ছেলেটার নাম—

কিসু : অধমের নাম কিসমাত।

মা : এদেরকে নিয়ে আর পারা গেল না আসাদ ভাই। একেবারে বুনো স্বভাব। এখানে সবকিছু ওদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে। যাকে দেখে তাকেই মনে করে একটা মজার বস্তু।

বেনু : এখানকার লোকগুলোই ও রকম, আমরাই কী করব!

কিসু : আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু মানব-চরিত্র সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা সত্যি ব্যাপক এবং আমি বলছি এখানকার লোকই এমন আজব যে ওদেরকে মজার বস্তু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ : তোমার মতো বয়সে সেটাই হয়তো স্বাভাবিক। এখনো ছেলেমানুষ।

কিসু : বয়সের কথাটা নিতান্ত অবান্তর। ছেলেমানুষ আমি ছিলাম সেটা সত্য এবং অনেক দিন ধরে ছিলাম। যেমন আপনিও একদিন ছিলেন। তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না।

বেনু : ওর কী রকম গলা শুকিয়ে এসেছে। কিছু চায়ের ফরমাশ করব মা!

মা : তোদের সঙ্গে আর কেউ পেরে উঠবে না।

বেনু : সাতজনের বন্দোবস্ত করতে বলেছ তো! ভুলে যেও না ঐ বাড়িওয়ালা বুড়োও আসছে কিন্তু।

মা : আমি কিছু ভুলি নি। কিন্তু ছিঃ বার বার ভদ্রলোককে বুড়ো বুড়ো বলো না।

বেনু : দুঃখিত। (হঠাৎ ভদ্রলোককে) আচ্ছা আমাদের প্রথম দেখে আপনার কী মনে হয়েছে! যে রকম ভেবে রেখেছিলেন ঠিক সেই রকম, না উল্টো কিছু!

মা : বেনু, তুমি যদি তোমার নিজস্ব প্রশ্নগুলো কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখো তাহলে উনি হয়তো তোমাদের কতগুলো জরুরি কথা শোনাতে পারেন। আরো স্পষ্ট করে বলছি। কিছুক্ষণ আগে তোমরা আমার কাছে যে সব প্রশ্ন করেছিলে, তার জবাব আমার হয়ে ইনিই দেবেন। আসাদ ভাই তোমার বাবার প্রাচীন বন্ধু, আমিও ওঁকে শ্রদ্ধা করি। আমার বিবাহিত জীবনের ইতিহাস উনি ভালো করেই জানেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সেটা বিচার করতে পারবেন। সে জন্যই সে কাহিনী শোনাবার দায়িত্ব আমি ওঁর ওপর দিয়েছি। রিজিয়ার বোধহয় এতে আপত্তি করবার কিছু নেই।

রিজিয়া : এমন দায়িত্ব যিনি স্বেচ্ছায় নিতে রাজি হন আমার চোখে তিনি অসীম শ্রদ্ধার পাত্র।

আসাদ : (একটু চঞ্চল হয়ে) না, না। কিছু না, কিছু না। এ আর এমন কী কঠিন দায়িত্ব! তবে কিনা এমন হঠাৎ করে রোকেয়া বোন— হুকুমটা করে বসল যে, সামলে নেবার সময়টা পর্যন্ত পেলাম না। তৈরি হবার একটু অবসর পেলেই—

বেনু : পাননি যে ভালোই হয়েছে। তৈরি করা কিস্‌সা আমরা পছন্দ করি না।

কিসু : যা খাঁটি সত্য—কেবল সেটুকুই বলুন।

বেনু : একদম রং না চড়ানো। একেবারে চাঁছা ছোলা।

আসাদ : (একটু চটে) আশা করি সে রকম সত্য গ্রহণ করার মতো গুরুত্ববোধ তোমাদের আছে।

কিসু : আশা করি আপনার বক্তব্যও যেন অনুরূপ মর্যাদাসম্পন্ন হয়। তবে জানেন কি, আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি মানুষের কাছ থেকে কখনই খুব বেশি কিছু আশা করা উচিত নয়।

মা : কি-সু!

কিসু : জি মা! বেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ : (গলা ঝেড়ে) তোমাদের বাবা-হ্যাঁ, তোমাদের বাবা—

বেনু : এখন বয়স কত ওর ?

কিসু : শ্‌যষ্‌।

মা : বেনু, তুমি যদি বারবার কথার মাঝখানে ফোঁর তোলো তাহলে ওঁর কথা শুনবে কখন ?

আসাদ : বড্ড ছেলেমানুষ এরা, বোন। (বেনুকে) তা তুমি যখন সবার আগে সেটাই জানতে চাও, বলছি। তোমার বাবার বয়স এখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

বেনু : অ্যাঁ ? (লাফিয়ে ওঠে) পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে ? শিগগির বলুন— কোথায় থাকেন উনি আজকাল ?

মা : বেনু, চুপ করে বসো।

আসাদ : থাক্‌ বোন। ও যখন অত চাইছে ওর প্রশ্নের জবাবই না হয় আগে দিয়ে নি। জবাব শুনে—চমকে যেও না বেনু, উনি এই শহরেই থাকেন।

[বেগম রোকেয়া সুলতানা স্তব্ধ, উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ। রিজিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে মাকে দেখছে।]

বেনু : (উল্লাসে) আমার তখনই মনে হয়েছিল। ভাইয়া এ পিয়াজদানীই আমাদের বাবা।

আসাদ : পিয়াজদানী।

বেনু : পিয়াজদান না ইয়াজদান একটা কিছু হবে। আমায় বলে কিনা আমার চেহারা নাকি অবিকল ওর মায়ের মতো। আমি তখনই জানলাম ও বলতে চেয়েছিল ওর মেয়ের মতো।

কিসু : (খুব গম্ভীর) দেখুন, আসাদ মামা, আপনাকে শ্রদ্ধা করবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কিন্তু তাই বলে যদি আপনি এখন কেসসা ফেঁদে বলে বসেন যে ঐ ডাক্তারের বাড়িওয়ালা মি. একরামুল ইয়াজদানীই আমাদের বাবা— তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে আপনার বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা হারাতে হবে।

আসাদ : কেন ?

কিসু : কেন ? সে বুড়ো ভদ্রলোককে আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি। আমার বাবা হবার তার কোনো যোগ্যতা নেই। এমনকি বেনুর বাবা হবার মতোও নয়। রিজিয়া আপার তো কথাই নেই।

আসাদ : তাই নাকি ? বড়ো লায়েক হয়ে গেছ, না ? তাহলে ভালো করে শুনে রাখ ছোকরা, তোমার পছন্দ হোক আর না হোক, মি. একরামুল ইয়াজদানীই তোমার এবং তোমাদের... তোমাদের তিনজনেরই বাবা। হয়েছে এবার ? কিছু বলতে চাও ?

বেনু : (ক্ষোভে কাতর) ইয়াজদানী সাহেব তো আপনার বাবা হয়ে গেলেন না, আপনি চটে যাচ্ছেন কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসু : (ভদ্রলোককে) এখন যে চোখ নিয়ে আপনি আমাদের বিচার করছেন সেটা হৃদয়হীনের চোখ। একটু ভেবে দেখুন— একটু আগেও আমরা কী ছিলাম! সম্পূর্ণ মুক্ত, আনন্দমুখর আধা-এতিম এক গুচ্ছ তরুণ-তরুণী। চারধারে কোনো আত্মীয়ের চেহারা দেখিনি কোনোদিন। ইচ্ছে মতন পছন্দ করে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি, অপছন্দ হলে বর্জন করেছি। অন্য কোনো রকমের সম্পর্কের ধার ধারিনি। এতটুকু বাধ্যবাধকতা ছিল না কোনোখানে। আপনি হঠাৎ কোত্থেকে এসে এক হুকুমনামা জারি করে দিলেন যে, এক সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আমরা নিকটতম আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ! আপনিই ভেবে দেখুন, এই ভদ্রলোককে আমরা একদম জানি না—

বেনু : আমি জানি। ভয়ঙ্কর বদরাগী বুড়ো।

আসাদ : (সম্পূর্ণ চটে গেছে) এই মেয়ে, সাবধান করে দিচ্ছি, যা তা বলো না। মি. ইয়াজদানীর চেয়ে মানী লোক তোমার ঐ গোটা বর্মা মুলুক চষে ফেললেও আরেকজন মিলবে না। হুম্। তোমার বাপ কে হবে না হবে সেটাও তোমার পছন্দ—অপছন্দের ওপর নির্ভর করবে নাকি? অনেক ডেঁপোমি দেখেছি, কিন্তু—

বেনু : (হঠাৎ) ঐ যাঃ, আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি, বুড়োর টাকা আছে?

আসাদ : মি. ইয়াজদানী এ তল্লাটের একজন নামজাদা ধনী।

বেনু : কী মজা! কী মজা!

কিসু : বেনু, মি. ইয়াজদানীকে হঠাৎ ওভাবে বিচার করা আমাদের খুব অন্যায় হয়েছে। যত ভেবেছিলাম তত খারাপ উনি নাও হতে পারেন। আমরা খুব লজ্জিত সে জন্য। (আসাদকে) তারপর?

আসাদ : তারপর, কিছু না। তোমাদের সামনে এ নিয়ে আমি আর কোনো কথাই উচ্চারণ করব না। তোমাদের আচরণে আমি মর্মাহত, স্তম্ভিত।

মা : (আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে, কোনো রকমে) আসাদ ভাই! কী কাণ্ডটা ঘটতে যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন আপনি? ওরা কী করে এসেছে, দেখছেন? সেই ভদ্রলোককে আজ এখানে চা খেতে দাওয়াত করে এসেছে। একটা কিছু করুন। হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বেন।

আসাদ : (এতক্ষণে খেয়াল হয়) অ্যাঁ! কী বলছ তুমি? এসব কথার মানে কী? ইয়াজদানী এখানে আসছেন?

কিসু : আসছে। কারণ, আমরা দাওয়াত করেছি, তিনি সেটা কবুল করেছেন। এর মধ্যে কিছু জটিলতা নেই। অতএব উত্তেজিত বা বিচলিত না হয়ে কী করবেন ধীরে সুস্থে ভাবুন।

মা : বেশি ভাবার আর সময় নেই এখন। আমি যা বলছি তা করুন। এখন আর অন্য উপায় নেই। যা হয় ওকে একটা কিছু বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : দোহাই মা, কিছু বলার দায়িত্ব আর ওঁকে দিও না। শান্ত হয়ে ধীরে সুস্থে গুছিয়ে কথা পেশ করা ওঁর ধাতে সয় না। দেখলে না, এই মাত্র আমাদের সামনে কী কাণ্ডটা করলেন।

আসাদ : এ দেখছি আচ্ছা ছেলে-মেয়ে! আমাকে কোনো কথা পুরোপুরি শেষ করার সুযোগ দিয়েছিলে তোমরা ?

বেনু : (ঠোঁট ফুলিয়ে) আপনি চটে গেলেন ? আমি কিন্তু খারাপ ভেবে কিছু বলিনি।

মা : রিজিয়া! চলো একটু ভেতরে যাই। হঠাৎ এসে পড়লে তখন ওঠার উপায় থাকবে না।

রিজিয়া : তখন না উঠলেই চলবে। আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না। ভয় কী, পালাব কেন ?

মা : বীরত্বের কথা তুলে বেশি বাহাদুরি দেখাতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর সেসব কথা ভেবে আমিও কিছু বলি নি। তবে এই মাত্র বার থেকে এসেছ। ভেতরে গিয়ে একবার হাতমুখ ধুয়ে পোশাকটা বদলে আসা উচিত। বেনু, তুমিও এসো।

[মা এগিয়ে যায়। রিজিয়া কঠিনতর মুখে বেরিয়ে যায়। বেনু নিরুপায় এবং করুণ মুখে বসেই থাকে।

ওয়েটার : (প্লেট চামচ নিয়ে ঢুকে, মাকে) মেহমানদের আসতে আর খুব বেশি দেরি আছে ?

মা : এক্ষুণি এসে পড়বেন। দুজন বেশি— সাতজনের জন্য জায়গা হবে কিন্তু।

[বলতে বলতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, ওয়েটার টেবিল সাজাতে থাকে।]

কিসু : আমার কী মনে হয় জানেন, আসাদ মামা ? মি. ইয়াজদানীকে সব কথা ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে হলে যথেষ্ট বুদ্ধি খাটাতে হবে। যে যাই বলুক, সে যদি পাকা লোক না হয় আর কায়দামাফিক প্যাঁচ কষতে না জানে, তাহলে সব একেবারে ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আপনার কী মনে হয় ?

আসাদ : নিশ্চয়ই। হেকমতের সঙ্গে এগুতে না পারলে, সব পণ্ড হয়ে যাবে।

কিসু : ঠিক। বেনু! সকাল থেকে এ পর্যন্ত যত লোক দেখেছ, আক্কেল আর হেকমত— তার মধ্যে— কার সবচেয়ে বেশি রয়েছে বলে তোমার ধারণা ?

বেনু : (লাফিয়ে ওঠে) ভাইয়া! পেয়েছি! ঠিক!

কিসু : এর চেয়ে যোগ্য লোক আর হতে পারে না। (ডাক দেয়) সৈয়দ!

ওয়েটার : জি!

[এগিয়ে আসে]

আসাদ : (আতঙ্কিত) শেষে ওয়েটারকে ? অসম্ভব। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। তোমাদের মতো আমার মাথা খারাপ হয়নি। অসম্ভব!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়েটার : (এগিয়ে এসে বিনীতভাবে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়ায়) জি ?

[ওয়েটারের নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আসাদ একটু দমে যায়। হতভম্ব হয়ে বসে থাকে।]

কিসু : সৈয়দ, তোমাকে একটা অনুরোধ করেছিলাম। ভুলে যাও নি বোধকরি। বলেছিলাম, আমাকে তোমার ছেলের মতো মনে করবে।

ওয়েটার : ভুলে যাব কেন ছোট সায়েব ? আপনি খুশি হবেন জানলে, যা বলবেন তাই করব।

কিসু : তাহলে শোন। আমার পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রথম অঙ্কেই তোমাকে এক প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে।

ওয়েটার : কে ? আপনার সত্যিকার বাবা ? তাতে কী হয়েছে ? প্রথম অঙ্কে না হোক শেষটায়, একসময় তো তাকে আসতেই হতো। (আসাদ সাহেবের দিকে ইশারা করে) কিছু মনে করবেন না। কে ? ইনি ?

আসাদ : অ্যাঁ! আমি এদের বাবা ? (উত্তেজিত) এ রকম উচ্ছৃঙ্খল চালচলন হবে আমার সন্তানদের ?

কিসু : যা মনে করেছ সৈয়দ তা নয়। উনি কেবল আমাদের সলিসিটর। যাক সে কথা। আচ্ছা সৈয়দ, মি. ইয়াজদানী বলে কাউকে চেন তুমি ?

ওয়েটার : কোন ইয়াজদানী ? হেকিমী দাওয়াখানায় যিনি বসেন ? লাল লাল চোখ, একটু ট্যারা ?

কিসু : অত বলতে পারব না বাপু। (আসাদকে) ওনার হেকিমী দাওয়াখানা আছে নাকি ?

আসাদ : (গভীরভাবে আলোড়িত) অসহ্য ! অসহ্য ! তোমার বাবা এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো নামজাদা ধনী। কাঠের কারবার করে লাখ লাখ টাকা করেছেন।

ওয়েটার : আস্তাগফেরুল্লাহ। গোস্তাকী মাফ করবেন। জনাব ইকরামুল ইয়াজদানীকে কে না চেনে ? ইয়া খোদা ! আপনি তাঁর ছেলে ?

কিসু : হুম্ ! আজ উনিও আমাদের সঙ্গে খেতে আসছেন।

ওয়েটার : (হকচকিয়ে) জি ? মানে উনি আগেও এখানে অনেকবার এসেছেন। আমাকে খুব পছন্দ করেন। তবে সপরিবারে আগে কোনোদিন আসেননি।

কিসু : আজও সেটা না জেনেই তিনি আসছেন। তোমাকে আরো স্পষ্ট করে বললে এই বলতে হয় যে তিনি এখনো জানেন না, আমরা তাঁর সন্তান এবং দেখেও চিনতে পারবেন না। কারণ, আঠার বছর পর আমরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

[বক্তব্যের সম্পূর্ণ গুরুত্ব ওয়েটারের মনে দাগ কাটুক, এই রকম একটা ভাব নিয়ে, কিসু লাফ দিয়ে পা ঝুলিয়ে টেবিলে চড়ে বসে এবং একদৃষ্টিতে ওয়েটারকে দেখে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : এবং আমরা চাই যে তুমিই ওঁকে সব কথা খুলে বলো ।

ওয়েটার : (হকচকিয়ে) জি ? মানে, কাউকে কিছু বলে দিতে হবে কেন ? আপনার মাকে দেখা মাত্রই তো ওঁর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

[কিসু একেবারে আকাশ থেকে পড়ে]

বেনু : কী আশ্চর্য, এমন সহজ কথাটাই এতক্ষণ ধরে আমাদের কারও খেয়াল হয়নি।

কিসু : আমি পর্যন্ত ভাবতে পারিনি। (আসাদকে) আপনার মাথায়ও এটা আসেনি।

বেনু : এদিকে খুব সলিসিটর বনে বসে আছেন।

কিসু : (আসাদকে) নিজস্ব পেশায় আপনার অযোগ্যতা অমার্জনীয়। সৈয়দ! তোমার বুদ্ধিমত্তার কাছে আমরা সবাই মাথা নত করে হার মানছি।

ওয়েটার : কিছু না, কিছু না। গরিবকে খামকা লজ্জা দিচ্ছেন। আপনাদের আনন্দ দিতে পারছি এটাই আমার খোশ-নসিব।

[নির্বিকার নৈপুণ্যের সঙ্গে টেবিল সাজাতে থাকে]

কিসু : (হঠাৎ আসাদের হাত পাকড়াও করে) দেখি, আপনার হাত দেখি। খেতে বসার আগে ভালো করে ধোয়ামোছার দরকার আছে। চলুন গোসলখানায়—

আসাদ : অ্যাঁ! তোমার মতো ইঁচড় পক্ক ডেঁপো ছোকরা আমার জীবনে আমি—

কিসু : ও কিছু নয়। আমাদেরকে প্রথম প্রথম সবারই ও রকম মনে হয়েছে। দু'দিন পর সব সয়ে যাবে। চলুন, চলুন।

[এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে আসাদ ছুটে বেরিয়ে যান। পেছনে পেছনে ভাই-বোন।]

বেনু : (বেরিয়ে যাবার মুখে) সৈয়দজী, আজ বুদ্ধি যেন ঠিক থাকে। একটু এদিক ওদিক হয়েছে কী লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে। হুঁশিয়ার!

ওয়েটার : কিছু ভয় নেই মা। এ বুড়ো ঠিক সামাল দেবে।

[ডাক্তার প্রবেশ করে, পেছনে ইয়াজদানী]

ইয়াজ : (হাঁপাতে হাঁপাতে) বাপরে, সিঁড়ি যেন আর শেষ হয় না। মাথাটা এখনো ঘুরছে। সব তোমার ঐ বিদঘুটে গ্যাসের জন্য। (বসে আরাম পায়)

ডাক্তার : ওয়েটার !

ওয়েটার : জি, হুজুর ?

ডাক্তার : বেগম রোকেয়া সুলতানা।

ওয়েটার : (অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত) এক্ষুণি খবর দিচ্ছি। তশরিফ রাখুন। মেহেরবানি করে এই বড় টেবিলটায় বসুন। আপনাদের জন্যই সাজানো হয়েছে। এখানেই ছিলেন সবাই এতক্ষণ। এক্ষুণি এসে পড়বেন। ভাইবোন, দু'জন তো এতক্ষণ শুধু আপনাদের কথাই বলছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : তাই নাকি ?

ওয়েটার : জি, দু'জনই একেবারে আনন্দের ফোয়ারা! চমৎকার মিঠা চালচলন। (ইয়াজদানীকে) অনেকদিন পর হুজুরকে দেখলাম। খোশ-নসিব। আমাকে দিন হুজুর।

[কথা বলতে বলতে মনভুলানো আগ্রহের সঙ্গে ইয়াজদানীর লাঠিটা নিয়ে ঠিক জায়গায় রাখল। গরম লাগছিল বলে কোটটা খুলতে সাহায্য করল ইত্যাদি।]

ঐ ভাইবোনের কথা বলছিলাম হুজুর। এমন সব মজার মজার আজব কথা বলবেন, শুনলে পেটে খিল ধরে যায়। ভাইটি আজ সকালবেলায় কী বললেন জানেন ? ওঁরা নাকি সব আপনার সন্তান।

ইয়াজ : অ্যাঁ ! আমার সন্তান !

ওয়েটার : কিচ্ছু না হুজুর, এমনি ফুর্তি। ছোটমিয়ার ঐ হয়েছে এক নতুন খেলা। আমি বুড়ো মানুষ। দাড়িটাড়ি আছে। গতকাল আমাকেই বলে বসলেন কিনা, বেয়াদবি মাফ করবেন, ওঁর বাবা সাজতে। আবার আজ সকালে যেই শুনলেন যে আপনি আসছেন, আমাকে ডেকে গতকালের পদ থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। বললেন, তাঁর অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া সত্যিকারের বাবাকে নাকি খুঁজে পাওয়া গেছে। আঠার বছর পর।

ইয়াজ : (চমকে) আঠার বছর ?

ওয়েটার : ছোট মিয়া তো তাই বললেন। আমি কিন্তু হুজুর কিচ্ছু প্রতিবাদ করিনি। ছেলেমানুষ। হঠাৎ একটা নতুন ফন্দি মাথায় এলে সেটা নিয়ে মেতে ওঠেন। ওর আনন্দটা মাটি করে আমার লাভ কী ? বড় হাসিখুশি ছেলেমেয়ে। কী মিঠা বুলি! দিল জুড়ানো চালচলন। (ডাক্তারকে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিয়ে) আমি দিচ্ছি, হুজুর। (ইয়াজকে) শুধু আমি কেন হুজুর! আরো একজন ভদ্রলোক ছিলেন। বড় শরীফ আদমি সলিসিটর। তিনি পর্যন্ত ছোট মিয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন।

ইয়াজ : ওহ্, এর মধ্যে আবার একজন সলিসিটরও জুটেছে!

ওয়েটার : এই পরিবারের সঙ্গে অনেক কালের জান পহ্ছান। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না হুজুর। (টেবিলটা একটু ঠিক করে বেরিয়ে যেতে যেতে) কী যেন নামটা শুনলাম, আমানুল্লাহ্-না-আসাদুল্লাহ্ সাব।

ইয়াজ : (বোমা ফাটল যেন) আসাদুল্লাহ্! (চিৎকার করে) খোরশেদ! ডাক্তার! (ডাক্তার ছুটে কাছে আসে) খোরশেদ! ষড়যন্ত্র, গভীর ষড়যন্ত্র! এরা আমাকে ফাঁদে ফেলতে চায়। জান, এরা কারা ? আমার ছেলেমেয়ে। আমার মারমুখো বিবি।

ডাক্তার : (শান্ত) সত্যি ? নাটকীয় পুনর্মিলন!

[টেবিলের কার্ড তুলে খাবারের তালিকায় ডুবে যায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : পুনর্মিলন! তোমার মুণ্ডু। আমি চললাম।

[যে কোটটা খুলে চেয়ারের হাতলে রেখেছিলেন, সেটা নিয়ে টানাটানি করতেই ওয়েটার ছুটে এসে সাহায্য করে]

ওয়েটার : আমি পরিয়ে দিচ্ছি, হুজুর। সব কথা ফাঁস করে দিয়ে ছোটমিয়ার ওপর বড় অন্যায় করে ফেলেছি, হুজুর!

ইয়াজ : থামো তুমি। (হঠাৎ ডাক্তারের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে) হ্যাঁ, তুমি, তুমিও আছ এর মধ্যে। তুমিও নিশ্চয়ই ওদের দলে যোগ দিয়েছ। তোমাকে আমি—

ডাক্তার : আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ইয়াজ : (চিৎকার করে) কী বললে তুমি ? দেখো ছোকরা, তোমাকে আমি—

[কিসু, বেনু এবং আসাদ সাহেব ঘরে ঢুকছেন]

ওয়েটার : (কানের কাছে, দরদ দিয়ে) চেপে যান হুজুর, সামলে নিন। ওরা এসে পড়ল বলে। (মাথা নিচু করে যেন কিছুই হয়নি কাজ করে যায়।)

[আসাদুল্লাহ্ এগিয়ে আসে সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে, ইয়াজদানীকে সালাম জানায়। ইয়াজদানী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আসাদুল্লাহ্ বিবেক পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টায় এদিক ওদিক তাকায়।]

ওয়েটার : (বেরিয়ে যাবার পথে, কিসুকে কানে কানে) জানিয়ে দিয়েছি সব।

কিসু : লাখ টাকার কাজ করেছ সৈয়দ। সাবাস!

[এগিয়ে যায়]

বেনু : (ফিস ফিস করে ওয়েটারকে) অবস্থা কী রকম ?

ওয়েটার : (চাপা গলায়) প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। এখন সামলে নিয়েছেন। (বেরিয়ে যায়)

আসাদ : (আলাপ শুরু করে) শেষ পর্যন্ত যা হোক এসেছেন তবু।

ইয়াজ : বলো, ধরা পড়েছি। ফাঁদে, জাঁতিকালে। ওগুলো কি আমার ছেলে মেয়ে নাকি ?

কিসু : (অমানুষিক ভদ্রতার সঙ্গে আসাদকে) ইনিই আমাদের বাবা ?

আসাদ : ঠিকই ধরেছ।

বেনু : (অন্যমনস্কভাবে, সামাজিকতার সঙ্গে) আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড় খুশি হলাম।

[তারপর এদিক ওদিক হাঁটতে হাঁটতে ডাক্তারকে একটা ভেংচি কাটে। তারপর অন্যমনস্কভাবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।]

কিসু : মেহমানের খেদমত করা আমি একটা বড় রকমের কর্তব্য বলে মনে করি।

[মি. ইয়াজ ক্ষুব্ধ, স্তম্ভিত, মর্মাহত! কিসু সেটা চাপা দেবার জন্য সহজ হতে চেষ্টা করে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসু : (হাতে মেন্যুটা তুলে নিয়ে) আসাদ মামা, আপনার জন্য কী হুকুম করব, বলুন।

আসাদ : বেশি কিছু নয়। হালকা কিছু। দু'একটা ক্রিমরোল, আর এক গ্লাস লেমন স্কোয়াশ। ব্যস আর কিছু নয়।

[বলতে বলতে বারান্দার অন্য কোণে চলে যায় যেন সকল রকম লোভ আর পাপ পেছনে পড়ে রইল]

কিসু : ডক্টর ?

ডাক্তার : ভুনা গোস্ত আর মোগলাই পরোটা। টিকিয়া, গ্ল্যাসি। সবগুলো একসঙ্গে অশোভন মনে হলে আলাদা আলাদা করে আনতে বলে দিন।

কিসু : সেটা ভালো বলেছেন। তা (ইয়াজদানীকে) আপনার জন্য কী ফরমাশ করব, তা কিন্তু এখনো বলেন নি।

ইয়াজ : এ ছেলে দেখছি বেজায় পাকা।

কিসু : ছেলে ? এত ছেলে ছেলে করছেন কেন ? (খুব সংযত কণ্ঠে) ছেলে হয়ে জন্মেছি, সেটাও কি আমার দোষ নাকি।

[ইয়াজদানী চটে গিয়ে মেন্যুটা ছিনিয়ে নেয়, পড়তে থাকে। পেছন থেকে বেনু উঁকি মেরে—]

বেনু : ওসব দাঁতভাঙা নাম পড়ে কিছু বুঝতে পারবেন না। তার চেয়ে আমার কথা ধরুন। বড় ভালো আইসক্রিম করে এরা, আঙুর বসানো।

ইয়াজ : এ দেখছি ভ্যালা বিপদ হয়েছে। শেষে এই পুঁচকে মেয়েটার হুকুম মানতে হবে নাকি ?

বেনু : পুঁচকে মেয়ে ? কী ভাষা আপনার ! যাকগে-এরপর থেকে আর কখনও ও রকম করে আমাকে সম্বোধন করবেন না। আপনি আমার মুরুব্বি। ইচ্ছে করলে আমার ডাকনাম পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেন। কিছু মনে করব না। কিন্তু পুঁচকে মেয়ে বলবেন না কখনো।

[ভাইবোন একদৃষ্টিতে এই আজব বুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকে]

ইয়াজ : (অবাকও হয়; কৌতুক অনুভব না করেও পারেন না) কী মনে হচ্ছে আসাদ মিয়া ? বেশ একটা জমকালো খানাপিনার এন্তেজাম করেছ মনে হচ্ছে।

আসাদ : (ফুর্তিভাব ফোটাতে বদ্ধপরিকর) যারা করেছেন তারা গরিব হলেও আপনার মতো আমিরেরও খেদমত করতে জানেন।

কিসু : কী তাকাল্লুফ! কী শরাফত! আহা-হা!

[রিজিয়াকে নিয়ে মা ঢুকেছে। মার চোখে-মুখে আতঙ্ক ও দৃঢ়তার মিশ্রভাব। সামনে ডাক্তার পড়তেই মা তাকে প্রশ্ন করছেন। রিজিয়া তীক্ষ্ণচোখে ইয়াজদানীকে পরখ করছে।]

মা : (ডাক্তারকে, হেসে) কয়েক ঘন্টা আগে মাত্র তোমার সঙ্গে পরিচয়। এরি মধ্যে এত আপন মনে হয়— কী বলব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[হঠাৎ ইয়াজদানীর দিকে চোখ পড়তেই থতমত খেয়ে যায়। চোখ মুখ বেদনায় ও দরদে রেখাময় হয়ে ওঠে।]

এ-কী— আপনি— তোমার চেহারা এত বদলে গেছে ?

ইয়াজ : (হিম) খুব বদলেছে নাকি ? তা আঠার বছর পর একটু আধটু পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নয়।

মা : (বেসামাল) আমি—মানে—সে কথা থাক। কোনো শক্ত অসুখ বিসুখ করেনি তো ?

ইয়াজ : শুক্‌রিয়া। না পরিবর্তনটা তুমি ধরতে পারনি। সেটার মূলে স্বাস্থ্য নয়, শান্তি বলতে পার। আমার জীবনের এই পরিবর্তনটুকুও তোমার চোখে পড়ল না! আজও সেই একই ভুল করলে—(হঠাৎ ভেঙে পড়ে ও চিৎকার করে) আসাদ, আসাদ, তাকাও, তাকাও একবার ওর দিকে। (আঙুল লম্বা করে দেখায়। থর থর করে কাঁপে) আর, (হাসি আর কান্না যেখানে অদ্ভুত করুণ শব্দ সৃষ্টি করে) আর আমার দিকে তাকাও একবার। আমাকে দেখো—

কিসু : (দরজার দিকে ইশারা করে) শ্ ষ্ ষ্! আহা! কী করছেন । সৈয়দ এসে পড়ল বলে।

বেনু : (দরদ দিয়ে ইয়াজদানীর কাঁধে চাপ দিয়ে) অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বলুন। কেউ বুঝতে পারবে না।

[সৈয়দ খাবার এনে সাজাতে থাকে। কিসু আর বেনু টপাটপ মুখে দিয়ে পরখ করছে সঙ্গে সঙ্গে। ইয়াজ ভ্রু কুঁচকায়। সৈয়দ বেরিয়ে যায় আরো কিছু নিয়ে আসতে।]

ইয়াজ : এ পরিবারে বুঝি কোনো শরাফতের বালাই নেই ? ভালো। কিন্তু শুরু করবার আগে বিসমিল্লাহ্ বলার দরকার হয় না নাকি ?

কিসু : হবে না কেন ? বললে কিছু ক্ষতি হয় না। তবে (কী একটা মুখে পুরে) কিসের উপরে বিস্‌মিল্লাহ্ করবেন, সেটা আগে একটু দেখে পরখ করে নিলে আরো ভালো হয়।

ইয়াজ : হুম্! অনেক কিছুই জান দেখছি। এসব হাদিস ফেকাহ কি মায়ের কাছ থেকে শিখেছ নাকি ?

মা : তোমাকে অনেকদিন বলেছি কিসু, দুনিয়ায় এমন লোকও থাকতে পারেন, যাঁরা আমাদের ধারায় অনভ্যস্ত, তোমার রসিকতায় তাঁরা বিরক্ত হন। তাছাড়া ভুলে যেও না, তোমার বাবা আজ আমাদের মেহমান।

ইয়াজ : বাহ্ ! চমৎকার! একই টেবিলে আজ আমি আমার স্ত্রী-পুত্রের মেহমান। (মুখের মধ্যে মস্ত এক ডেলা খাবার পুরে দেয়।)

বেনু : (দরদ দিয়ে) খুব অস্বস্তি বোধ করছেন, না ? কী করবেন ? আমাদের দশাও তথৈবচ।

কিসু : শ্ ষ্ ষ্। তোকে বারবার বারণ করে দিয়েছি যখন তখন মুখ খুলবি না, আর সর্বক্ষণই তোর একটা না একটা বেফাঁস কথা বলা চাইই। (ইয়াজদানীকে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখুন, আমরা মুখে যাই বলি না কেন, দিল একদম সাফ। পিতৃভক্তি প্রকাশিত হচ্ছে না, সেটা নিছক অনভ্যাসের দোষ। আশাকরি আমাদের ভুল বুঝবেন না আপনি। (সৈয়দকে) সৈয়দ, হাওয়া গুমোট, রাস্তা বাতাও।

ওয়েটার : জি হুজুর। এক্ষুণি আনছি। আইসক্রিম আঙুরদানা বসানো। জি! (চলে যায়)

[বেনু হাততালি দেয়। কিসু ও ডাক্তার উৎসাহিত। সবাই নিঃশব্দে খায়। সৈয়দ আইসক্রিম নিয়ে আসে।]

আসাদ : শেষ পর্যন্ত যা হোক সন্ধ্যাটা ভালোই কাটছে।

বেনু : 'শেষ পর্যন্ত যা হোক' মানে কী? কী বলতে চান, পরিষ্কার করে বলুন।

ইয়াজ : আশ্চর্য যে তোমাদের বাবা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের বিকেলটা একদম মাটি হয়ে যায় নি। কী আসাদ মিয়া, এইটেই তো বলতে চেয়েছিলে, না?

আসাদ : (বিব্রত) কী যে বলেন! মানে—'শেষ পর্যন্ত যা হোক'—এ হলো একটা কথার কথা, আপনি মানে, ছি, ছি—

ইয়াজ : (কিসুকে) জীবনে কী করবে, কিছু ঠিক করেছ?

কিসু : এখনো করিনি। মনের দুয়ার খোলা রেখে দিয়েছি। সৈয়দ!

ওয়েটার : জি!

কিসু : হোটেলের ওয়েটার হতে চাইলে কতদিন পরিশ্রম করতে হবে, বলতে পার?

ওয়েটার : ও ছোট সাহেব কেউ শিখতে পারে না। পরিশ্রম করে কোনো লাভ নেই। কারো এমনিতেই হয়, কারো শত চেষ্টাতেও কিছু হয় না। (রিজিয়াকে) আপনাকেও আইসক্রিম দেব? (রিজিয়া মাথা নাড়ে) খাঁটি খিদমতগার হবার ক্ষমতা নিয়ে খুব কম লোকই জন্মায়, ছোট সাহেব।

কিসু : তোমার নিজের কোনো ছেলে নেই?

ওয়েটার : একজন। (একে ওকে ওটা এটা দেয়)

বেনু : কী করে? এই একই কাজ?

ওয়েটার : ওহ্! না। এই কাজ ও একদম পারত না। ভয়ংকর কড়া মেজাজ। ও হাইকোর্টে আছে।

আসাদ : পিয়ন বুঝি?

ওয়েটার : জি না, পেশা আপনারই, নতুন যোগ দিয়েছে, অ্যাডভোকেট।

আসাদ : অ্যাঁ! ওহ্। মানে আমি খুব লজ্জিত— মানে—

ওয়েটার : কিছু না, কিছু না। ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাতে কী হয়েছে? আমার তো মাঝে মাঝে মনেই হতো যে, ওর পিয়ন হওয়া অনেক ভালো ছিল। (ডাক্তারকে খাবার এগিয়ে দিয়ে) জানেন স্যার, অন্য যে-কোনো চাকরি করলে সাঁইত্রিশ বছর পর্যন্ত ওর খরচ আমাকে চালাতে হতো না। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাদের দোয়ায় এখন ভালোই আছে। বেশ পসার। মাসে হাজার দু'হাজার করে কামাচ্ছে।

আসাদ : (ইয়াজদানীকে) এই হলো নয়া জামানা। ভাই, নয়া জামানা। গণতন্ত্র! গণতন্ত্র!

ওয়েটার : (খুব শান্ত) গণতন্ত্র ? গণতন্ত্র নয়, হুজুর। সামান্য একটু পড়ালেখা। ব্যস্। আর কিছু নয়। শিক্ষাটাই আসল। সাহেবী স্কুল, সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বৃত্তি। ধাপে ধাপে উঠে গেছে। (বেনু তার হাত টেনে কানে কানে কী বলে। (হেসে) নিশ্চয়ই। আরো ক্রিমরোল আর কফি, এই তো ? এক্ষুণি আনছি। (আসাদকে) ছেলে আমার ভালোই করেছে। কোনো কাজকর্মেরই ও কিছু বুঝত না। পড়ালেখাও যদি না শিখতে পারত, তা হলে না খেয়ে মরত।

[সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে বেরিয়ে যায় নির্লজ্জ বেনুর ফরমাশ আনতে]

ডাক্তার : এখন দেখব কার কত মুরোদ। এবার হুকুম দিয়ে কথা বলুন তো সৈয়দকে।

বেনু : কিন্তু আমি যে তাকে দিয়ে আরো কফি আনতে পাঠালাম। দোষ করেছি, না ? না। সৈয়দ ভালো লোক। আমি জানি, ও কিছু মনে করবে না।

ইয়াজ : মনে করার এতে কিছু নেই। দোষ তোমাদের। যার যা কাজ সেটা ভালো ভাবে করে যাওয়াই তার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। তার ফুর্তি, ইজ্জত সবকিছুই তার মধ্যে। ওর কাজ ওকে করতে না দিয়ে তার মধ্যে তোমরা নাক সেঁধোও বলেই এইরকম গোলমালের সৃষ্টি হয়।

বেনু : এমন চমৎকার একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে যে এটা না হলেই আফসোস করা উচিত ছিল। আমরা নাক না সেঁধোলে আপনি ওর ছেলের অমন আশ্চর্য পরিচয় জানতে পারতেন! ভালোই হয়েছে মা, হয়তো ধরে বসলে, চাই কি, সৈয়দ ওর ছেলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে, আমরাও সেই সূত্রে চট করে এখানকার খান্দানি সমাজের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারি। এটা কম লাভ হলো ?

[সৈয়দ ট্রে নিয়ে ঢুকেছে]

ইয়াজ : খান্দানি সমাজ! (ঘোঁৎ ঘোঁৎ) তোমাদের মতো ছেলেমেয়েরা কোনো সমাজেই মিশতে পারবে না। তোমাদের চালচলন দেখে সভ্যসমাজ মাত্রই আঁতকে উঠবে।

বেনু : (ক্ষেপে গিয়ে) দেখুন, আপনি বুড়ো মানুষ, বয়সে অনেক বড়, নইলে এমন জবাব মুখে এসেছিল আমার! আপনি যদি ভেবে থাকেন যে—

সৈয়দ : (মোলায়েম গলায়) ক্রিমরোল। আইসক্রিম। আঙুরদানা বেশি করে বসিয়ে এনেছি।

বেনু : (সামলে নেয়) সৈয়দ ! তোমার মতো সময়জ্ঞান দুনিয়ার কারো নেই। (চুমুক) .

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ : (রিজিয়াকে, আলোচনার মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করে) আচ্ছা রিজিয়া, তোমাদের ঐ বর্মা মুলুকে কোন ধর্মের প্রচলন সবচেয়ে বেশি ?

রিজিয়া : বোধহয় বৌদ্ধ। তা' ধর্মের খোঁজ-খবর বেশি রাখতাম না।

বেনু : ওদের ধর্ম যাই হোক, চালচলন কিন্তু বড় অদ্ভুত! জান আসাদ মামা, চাকর বাকরগুলো রোজ সকালে ঘরে ঢুকেই হাঁটু গেড়ে বসে, গড়গড় করে গতদিন যত অপরাধ করেছে সব স্বেচ্ছায় স্বীকার করবে। তারপর বলবে, 'মা' বলুন ক্ষমা করেছেন। কী করা, তখন আমাদের ভান করতে হতো যেন সব মাফ করে দিয়েছি! আচ্ছা এখানকার বেশির ভাগের ধর্ম কী ? এখানেও কি অপরাধ করলে স্বীকার করে ? ক্ষমা চায় ?

সৈয়দ : এদিকে ও রকম রেওয়াজ নেই। থাকলেও এত অল্প যে নজরে পড়ে না। (রিজিয়াকে একটা ডিশ এগিয়ে দেয়) ধর্ম একটা সকলেরই আছে। বেশির ভাগই একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের সভ্য।

বেনু : সভ্য হতে হলে কত করে চাঁদা দিতে হয় ?

ইয়াজ : (আঁতকে, শিউরে, লাফিয়ে) আসাদ মিয়া! দ্যাখো, দ্যাখো, ভালো করে দ্যাখো! আমার সন্তান কী শিক্ষায় মানুষ হয়েছে, একবার চোখ মেলে দ্যাখো। কান পেতে মেয়েটার কথা শোন! তোমার জানের কসম, আসাদ মিয়া, তুমি একবার— (সুসজ্জিত টেবিল বিপর্যয়ের সম্মুখীন)

মা : আহ্ কী করছ! অত উত্তেজিত হওয়ার মতো কিছুই বেনু বলে নি। ওরা বড় হয়েছে বিদেশে, একেবারে অন্যরকম আবহাওয়ায়! ওদের কথায় উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোনো মানে হয় না। শান্ত হয়ে বসো।

ইয়াজ : (ফোঁস ফোঁস) বসব! আমার চোখের সামনে এগুলো ঘটবে আর আমি চুপ করে বসে থাকব, না ? কিছু বলতেও পারব না !

ওয়েটার : আপনার চা'টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে হুজুর ?

বেনু : সৈয়দ, সিগারেটের টিনটা কোথায় ?

[সৈয়দ অন্য প্রান্ত থেকে সিগারেট-অ্যাসট্রে নিয়ে আসে। বেনু একটা তুলে নিয়ে ধরাবার আগে নখে ঠুকতে থাকে।]

ইয়াজ : (যেন ভূত দেখেছে, বিস্ফারিত চোখে) এই মেয়েটা কী বিড়ি-তামাকও খায় নাকি ?

বেনু : (বিরক্ত) আমার কিছুই দেখছি আপনার সহ্য হয় না। আমি সামনে থেকে কেবল আপনার খাওয়ার আনন্দটা মাটি করছি। বেশ, তার চেয়ে বরঞ্চ আমিই না হয় উঠে যাচ্ছি। (সবাইকে) এতক্ষণে দক্ষিণের বারান্দায় নিশ্চয়ই নদীর হাওয়া বইছে। সিগারেটটা শেষ হলেই ফিরে আসব। (চলে যায়)

ইয়াজ : (চরম ক্ষেপে) রোকেয়া ভালো হবে না বলছি। মেয়েটাকে আসতে বল এদিকে। ভালো চাও তো এখনো মেয়েটাকে ফিরিয়ে আন, বলছি।

আসাদ : (শান্তি স্থাপনের চেষ্টায়) আহা হা, অত বেসামাল হলে চলবে কেন ? একটু সমঝে বুঝে এগুতে হবে তো ? কাকে কী বোঝাব আরে বাবা, ও মেয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজাজ তো আমরাও দেখছি। হবে না কেন ? শত হলেও বাপকা বেটি— দোষ দেব কাকে ?

মা : (ফোঁস করে) মাফ করবেন, আসাদ ভাই, আমার মেয়ের মেজাজ কারো কাছ থেকে ধার করা নয়। ওটা ওর নিজস্ব। আপনারা সবাই মিলে ওর মেজাজ এমন করে বিগড়ে দিয়েছেন যে, বেচারিকে শেষ পর্যন্ত এখান থেকে উঠে যেতে হলো। মাফ করবেন, ওকে একটু না দেখে আমিও চুপচাপ এখানে বসে থাকতে পাচ্ছি না। (দাঁড়ায়)

ইয়াজ : তুমি আমার বিরুদ্ধে— ওর পক্ষ নিচ্ছ ?

মা : (আমল না দিয়ে, রিজিয়াকে) রেজু মা, তুমি একটু এদের দেখো, আমি ততক্ষণে আসছি (চলে যায়)।

[সৈয়দও আস্তে আস্তে চলে যায়। স্তব্ধ হয়ে যান ইয়াজদানী। মুখ চোখ আবেগে কুঞ্চিত কম্পিত।]

ইয়াজ : চমৎকার! আসাদ মিয়া— চমৎকার মা! তোমাদের এ যুগের আদর্শ আধুনিক মাতা। কথা বলছ না কেন ?

রিজিয়া : বলবার কিছু নেই তাই। আমাদের মায়ের তুলনা হয় না। আমাদের মা গর্ব করার মতো মা।

ইয়াজ : আর আমি ? আমি ? আমি কিছু না, না ? আমাকে স্বীকার করা লজ্জাজনক, না ? আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত অপমানকর, না ? বলে ফেল— থামলে কেন, সব বিষ একেবারে উগলে দিচ্ছ না কেন ?

ডাক্তার : (বিচলিত) মিস আহ্সান

ইয়াজ : থামো তুমি। মিস আহ্সান কে ? এর নাম রিজিয়া— আমার মেয়ে। বিলিতি কায়দায় ডাকতে চাও, মিস ইয়াজদানী বলো। আহ্সান আহ্সান করো না।

ডাক্তার : (আমল না দিয়ে) আমি অত্যন্ত লজ্জিত মিস আহ্সান! আমাকে ক্ষমা করবেন। সব দোষ আমার! মি. ইয়াজদানীকে আমিই এখানে এনেছি। অপরাধ আমার। উনি যে কাণ্ডটা করলেন সেজন্য আমি আন্তরিক ক্ষমা চাইছি।

ইয়াজ : কী বকছ ছোকরা ? হুঁশ হারিয়ে ফেলেছ নাকি ?

রিজিয়া : (ডাক্তারকে) না না, সে কি ? এমন কী কাণ্ডকারখানা হয়েছে যার জন্য এত ঘটা করে ক্ষমা চাইছেন ? আমরা সবাই একটু বেশি মাত্রায় ছেলেমানুষী করেছি, এই যা ? ক্ষতির মধ্যে এই হয়েছে যে, খাওয়া-দাওয়াটা একটুক্ষণের জন্যও জমতে পারল না। খামকা ভান করে লাভ নেই। যে মজলিশটা সহজে জমে না, সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।— কী বলেন ? (উঠে বাবার কাছে এসে) আচ্ছা— আমি তাহলে উঠলাম, বাবা। রোদ পড়েছে। বাগানে বসে একটু পড়াশুনা করব।

[বেরিয়ে যায়। নির্বিকার। কারো দিকে ফিরেও তাকায় না। ইয়াজদানী সাহেব উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠেন। আবেগে মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। আসাদও বেরিয়ে যায়।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : শুনলে ? শুনলে আসাদ মিয়া ? মেয়েটি আমাকে বাবা বলে ডাকল বাবা! বাবা!

ওয়েটার : (ডাক্তারকে মাঝখানে রুমাল দিয়ে বন্ধ করা একটা বই দেখিয়ে) বাগানে বই পড়বার জন্য গেলেন মনে হলো, অথচ বইটা দেখছি এখানেই ভুলে ফেলে গেছেন।

ডাক্তার : (ছোঁ মেরে বইটা নেয়) আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। যাবার সময় আমিই দিয়ে যাব। (তারপর ইয়াজদানীকে) যে কাণ্ডটা আজ আপনি এখানে করলেন, তার জন্য আপনার রীতিমতো লজ্জিত হওয়া উচিত।

ইয়াজ : আমি ? আমি করেছি ? আমি লজ্জিত হব ?

ডাক্তার : একশ'বার লজ্জিত হওয়া উচিত আপনার। ছিঃ ছিঃ। আপনাকে এখানে সঙ্গে করে এনেছি আমি। আপনার মেয়ে এখন আমার সম্পর্কে কী যা-তা ভাবছে। লজ্জায় মরে যাচ্ছি আমি।

ইয়াজ : দেখো ছোকরা, আমার মেয়ে তোমার সম্পর্কে কী ভাবছে, তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

ডাক্তার : তা থাকবে কেন ? অন্যের জন্য ভাববেন কেন ? নিজেরটা নিয়েই এত ব্যস্ত থাকলে অন্যের কথা ভাববার অবসর কোথায় ? ভালো করে চিনলাম আপনাকে আজ।

ইয়াজ : (দরদভাঙা গলায়) মেয়েটা আমায় কীভাবে ডাকল শুনেছ ? বাবা! বাবা! হুম্-পিতা-এমন এক পিতা যার কাছ থেকে দস্যু এসে সমস্ত সন্তান লুট করে নিয়ে গেছে। আমায় বলতে পারো, এই নয়া জামানার এদের হৃদয় বলে কিছু নেই ? আঠার বছর পর আজ এই প্রথম দেখা— সে কি এই দেখব বলে ? চেহারা, চালচলন কথাবার্তা— আমার নিজের সন্তান— অথচ আমি নিজে চিনতে পারি না। কোনোদিন কল্পনাও করিনি এ রকম। আমার সঙ্গে এমন করে ব্যবহার করল যেন আমি বাইরের লোক, মেহমান, তার চেয়ে বেশি কিছু নই। আঠার বছর ধরে, বাড়ি ভর্তি নফর, নওকর, কর্মচারী নিয়ে বাস করেছি, তারা আমাকে শ্রদ্ধা করেছে, কখনো কখনো ভালোও বেসেছে। আর ঐ পুঁচকে মেয়েটা আমার সঙ্গে কেমন করে কথা বলল, শুনেছ তুমি ? আমার নিজের ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণ আমাকে নিয়ে কেমন হাসি-তামাসা জমিয়ে তুলেছিল, লক্ষ করেছ তুমি ? আর আমি ওদের আব্বা— পিতা—

ডাক্তার : যেতে দিন, যেতে দিন। ছেলেমানুষ— না বুঝে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে হয়তো। তাও সবাই নয়। আপনার বড় মেয়ে তো আপনাকে বাবা বলে সম্বোধন করতে ভোলেনি, এটা কি কম হলো ?

ইয়াজ : হুম্ ! বাবা! বাবা বলে ডেকে বিদায় নিল—'এখন তাহলে উঠি বাবা'—যেন মেহমানদারী করছে আমার সঙ্গে। বাবা বলে ডেকে কলিজায় ছুরি বসিয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (বিরক্ত) দেখুন, ওগুলো আপনার আবার একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। যা বলার দয়া করে রিজিয়াকে বাদ দিয়ে বলবেন। রিজিয়া আপনার জন্য যথেষ্ট দরদ দেখিয়েছে। আপনার চেয়ে হাজার গুণ বেশি মসিবতের মধ্যে আমার সময় কেটেছে।

ইয়াজ : তোমার ?

ডাক্তার : হ্যাঁ, আমার। ওর পাশে বসেছিলাম আমি। তবু একটা কথাও বলতে পারিনি ওকে। মাথায় জোগাল না।

ইয়াজ : আশ্চর্য!

ডাক্তার : আশ্চর্য! হুম্, আপনি কী বুঝবেন এর! আমার আজ কী হয়েছে বলতে পারেন ? ডাক্তারখানায় আপনার সঙ্গে আজ মশকরা করেছি। এর আগে কোনো রোগীর সঙ্গে আমি সে রকম ব্যবহার করিনি।

ইয়াজ : সেটা আশার কথা।

ডাক্তার : কিন্তু আজ আমার কী হয়েছে জানেন ? আজ আমি উন্মাদ, পাগল, অথবা এও বলতে পারেন যে, আজ প্রথম আমার চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। আজ আমার নবজন্ম, আমার মধ্যে আজ নতুন শক্তির জাগরণ। আজ আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি। এতদিন পরে আজ আমি বড় হয়েছি। আমাকে কে এই নবশক্তি দান করেছে ? কে ? ভাবতে পারেন কে ? আপনারই ঐ কন্যা— রিজিয়া।

ইয়াজ : স্পষ্ট করে কথা বল। তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা হয়েছে নাকি ?

ডাক্তার : ভালোবাসা ! এ চেতনা তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বের সম্পদ। এই চেতনাই জীবন, এই চেতনাই শক্তি, এর নামই মুক্তি, স্বর্গ!

ইয়াজ : আবোল-তাবোল বকো না। বিয়ে করে বৌকে খাওয়াবে কী ? সে যোগাড় করেছ ? তার আগে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে কে ?

ডাক্তার : বিয়ের কথা আমিও ভাবিনি। ঐ সুকোমল করস্পর্শেই আমি ধন্য। পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে আত্মনিবেদন করতে পারলেই আমি তুষ্ট। এ জীবন আমি তার নামে উৎসর্গ করেছি। এ জীবন যে রাখব— সে শুধু তারই জন্য, দরকার হলে দান করব— সেও তারই জন্য। এর চেয়ে বেশি আর কিছু চাই না। যাই, ওরই করস্পর্শে উষ্ণ এই বই আর রুমালটা ওকে দিয়ে আসি।

[বেরুতে গিয়ে সৈয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ]

সৈয়দ : সামলে হুজুর। ব্যথা পাননি তো ?

ডাক্তার : মাফ করবেন। আমি ঠিক—

সৈয়দ : কিছু না, কিছু না। ওতে আর এমনকি হয়েছে ? এই বয়সে সবারই একটু-আধটু ঐরকম হয় বৈকি ? আমাকে ঐ বইটা নেবার জন্য আবার পাঠিয়েছিলেন। আপনি কি এখনি যাচ্ছেন ঐ দিকে ?

ডাক্তার : ঐ দিকেই যাচ্ছিলাম আমি। কিছু মনে করবেন না। আমার দেড়মাসের এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোজগার আপনি গ্রহণ করুন। আপনি শ্রমের মর্যাদা বোঝেন, আরেকজন শ্রমজীবীর আন্তরিক দানকে আশা করি অবজ্ঞার চোখে দেখবেন না।

[পকেট থেকে নতুন পাঁচ টাকার নোটটা বের করে দেয়]

সৈয়দ : (গ্রহণ করে, সালাম ঠুকে) শুকরিয়া! (ডাক্তার ছুটে বেরিয়ে যায়) বড় দিলখোলা লোক। একটু তাড়াহুড়ো করে চলেন— তবুও বেশ লোক। আকল আছে, হিম্মৎ আছে।

ইয়াজ : হুম্। নইলে এত তাড়াহুড়ো করে হয়তো অর্ধেক রাজত্ব লাভ করতে পারত না। দেড় মাসে পাঁচ টাকা কামিয়ে এখন একদিনে তকদির উল্টে ফেলতে চাইছে।

[পায়চারি করে]

সৈয়দ : (দার্শনিক ভাবে) কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না, হুজুর। ছোটমুখে বড় কথা শোভা পায় না, তবু বলছি, জিন্দেগি সম্পর্কে এই আমার অভিজ্ঞতা। কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না— আরেক পেয়ালা চা এনেছিলাম। আদা দিয়েছি।— কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না। এই আমার ছেলের কথাই ধরুন না হুজুর। চকচকে সাটিনের আলখাল্লা পরে একদিন ও গটমট করে হাইকোর্টে যাবে, একি আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভেবেছি! আর এখন মাসে দু'চার পাঁচ হাজার পর্যন্ত রোজগার করে। দুনিয়া বড় আজব জায়গা হুজুর।

ইয়াজ : আশা করি, তোমার ছেলে লায়েক হয়ে বাপকে ভুলে যায়নি নিশ্চয়ই। টাকার গুমটে বাপের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা সব বিলকুল ভুলে বসে আছে নাকি?

সৈয়দ : আমাদের বাপ-ছেলের সম্পর্ক হুজুর ভালোই, খুবই ভালো। সমাজের চোখে আমাদের পার্থক্যটা এত বড় হওয়া সত্ত্বেও আমরা মোটামুটি এ ওকে মেনে চলতে শিখে নিয়েছি।—একরত্তি চিনি মিশিয়ে দি, আদার তারটা হালকা করে দেবে।—ছেলেকে আমি কি বলি, জানেন হুজুর? আমি বলি, দ্যাখো, আমি হোটেলের খিদমতগার। মাথায় পাগড়ি চড়াই, কারণ সেটাই আমার পেশার পরিচয়। তুমি চোগাচাপকান চাপিয়ে গলায় ফিতে বাঁধ, তাতেই তোমার পরিচয়। কোনোটাতেই অগৌরবের কিছু থাকতে পারে না। আমার ব্যবহারে কথায় খুশি হয়ে লোকজন আমাকে বেশি বেশি এনাম দেন। তাতেই আমার রোজগার বাড়ে। তোমাকে দেয় ফি। কোনো পার্থক্য নেই। তোমার পেশায় তোমাকে ভালোমন্দ হরেক রকম লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, আমার বেলাতেও তাই। অ্যাডভোকেট ছেলের বাপ খিদমতগার, ছেলের পক্ষে সেটা কেউ কেউ একটু অস্বস্তিকর মনে করে। বাপের পক্ষেও যে সেটা একটু অসুবিধাজনক হতে পারে, সে কথাটা আর কেউ ভেবে দেখে না হুজুর।—আপনাকে আর কিছু এনে দেব?

ইয়াজ : না, না। কিছু দরকার নেই। এমনি আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ : সে আপনার মেহেরবানি। আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কী হতে পারে! এ জায়গা যতই আপনার কাছে নিজের ঘর-বাড়ির মতো মনে হবে, ততই আমাদের গৌরব।

ইয়াজ : আমার ঘরবাড়ি ?

সৈয়দ : জি, দেখুন না— তাই তো। এই মানে— মানুষ হোটেলে আসে কিছুক্ষণের জন্য ঘর-সংসার ভুলে থাকার ইচ্ছায়। অথচ ঘরের আরামটা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে সংসারের জ্বালাটাও ভোলা যাবে না।

ইয়াজ : আমার নসিবে কিন্তু উল্টোটাই ফলল। ঘরে-বাইরে সংসারের জ্বালা। এতটা কিন্তু আমিও আশা করিনি।

সৈয়দ : জি— মানে, নসিবের ব্যাপারটাই বড় উল্টোপাল্টা, উল্টোটাই বেশি ঘটে। কী করবেন হুজুর, দুনিয়াটাই বড় আজব জায়গা। আগে থেকে বলা কিছুই যায় না।

[চলে যায়]

ইয়াজ : ঘর ! সংসার ! সুখের ঘর-সংসার!

[কারো পায়ের শব্দ শুনে চমকে দরজার দিকে তাকায়। শক্ত হয়ে বসে অপেক্ষা করে। রিজিয়া ঢুকেছে। কী একটা ফেলে-যাওয়া জিনিস খুঁজতে। ইয়াজদানী মেয়ের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ঠোঁট দৃঢ়তায় কুঞ্চিত। চোখ আবেগে কাতর। রিজিয়াও টেবিলে ভর করে দাঁড়িয়ে ইয়াজদানীকে দেখে, দৃষ্টি একেবারে বুকের ভেতর পর্যন্ত মেলে দেয়। বুড়োর দুর্বলতা কোথায়, নিশ্চয়ই বোঝে। কৌতূহল হয় আরো ভালো করে বোঝার, কিন্তু বাইরে অনাত্মীয় ভাব সম্পূর্ণ অটুট রাখে।]

রিজিয়া : আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই।

ইয়াজ : অ্যাঁ ? সত্যি ? আশ্চর্য তো ! আঠার বছর পর বাপের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই তাকে তুমি কিছু বলতে চাও, কী অবাক কাণ্ড ! কী মর্মস্পর্শী !

রিজিয়া : আবেগ-উচ্ছ্বাসের কথা ছেড়ে দিন, আমাদের ক্ষেত্রে ওগুলো নিতান্তই অবান্তর এবং অর্থহীন। আপনি কি আশা করছিলেন যে আপনাকে দেখামাত্র আমরা আবেগে বেহুঁশ হয়ে পড়ব ? আমাদের সঙ্গেই বা আপনি এমন ব্যবহার করছেন কেন ? আপনি যে আমাদের খুব পছন্দ করেন না, সেটা যে-কেউ বুঝতে পারে। সে জন্য আমরা কোনো নালিশ করেছি আপনার কাছে ? আমাদের কথা হচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে অপছন্দ করি বলে, দেখা হওয়া মাত্রই ঝগড়া শুরু করতে হবে— তার কোনো মানে নেই।

ইয়াজ : (চোখ ঝাপসা হয়ে আসে) আমি তোমাদের পিতা, এ সত্যটুকু উপলব্ধি কর ? এর একটা মানে আছে ,তা স্বীকার কর ?

রিজিয়া : একশ'বার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : সন্তানের কাছ থেকে যে পিতার কিছু প্রাপ্য থাকতে পারে— তা মানো ?

রিজিয়া : দু'একটা উদাহরণ দিন। যথা—

ইয়াজ : তুমি উদাহরণ চাও আমার কাছে ? যথা কর্তব্য, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বাধ্যতা—

রিজিয়া : (হঠাৎ আলসেমি ঝেড়ে) দেখুন, একমাত্র আমার বিবেক আর বুদ্ধি ছাড়া আমি আর কারো কাছে বাধ্য নই। যা ন্যায় তাকে শ্রদ্ধা করি। যা মহৎ তাকে আমি ভক্তি করি। (দাঁত চেপে) আর এ যে স্নেহ-ভালোবাসার কথা বললেন, সেগুলো আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। সেগুলো আমি বড় বেশি ভালো করে বুঝিও না।

[বক্তব্য খতম করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে]

ইয়াজ : (চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করে) এইমাত্র যা বললে ওগুলো তোমার মনের কথা ?

রিজিয়া : (ঝাঁঝ) নয়তো কী বানিয়ে বলছি নাকি ? এ রকম প্রশ্ন ভবিষ্যতে করবেন না। এখন কী বলতে যাচ্ছিলেন, বলুন। আবেগ বাদ দিয়ে বিচারবুদ্ধি সজাগ রেখে, যদি বলতে পারেন বলুন।

ইয়াজ : বিচারবুদ্ধি সজাগ রেখে, আবেগ বাদ দিয়ে— না! না! তা আমি পারব না। বুঝতে পারছ— তা আমি পারব না। পারব না। বুঝতে পারছ ?

রিজিয়া : না। এ রকম অবস্থা বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে এবং এ রকম লোকের জন্যও আমার দরদ নেই।

ইয়াজ : (কাতর কাকুতি) চুপ করো। আর বলো না। তুমি জানো না, কী করছ তুমি। আমাকে কি পাগল করে দিতে চাও ? (রিজিয়া ভ্রু কুঁচকায়) না, না। আমি রাগ করি নি। একটুও উত্তেজিত হইনি। যা বলার এখুনি বলছি আমি। (একটু দম নিয়ে) ভাববার সময় দাও আমাকে। (আধ মিনিট ঠায় বসে থাকে। রুমাল দিয়ে মুখ চোখ ভালো করে মুছে, একটা চেয়ার টেনে রিজিয়ার কাছে বসে। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় শান্ত মোলায়েম গলায়) এইবার বলছি। মানে, ঠিক তোমার মতো করে বলতে পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টা করব।

রিজিয়া : চেষ্টা করলে পারবেন। আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে বুদ্ধির সাহায্য নিলে, মনের সমস্যা মিটে যেতে বাধ্য।

ইয়াজ : বুদ্ধি! বুদ্ধি! মাথাটা বাদ দিয়ে একটু দরদ দিয়ে কথা বল। ভাবতে আমি চাই না, আমি অনুভব করতে চাই। বিশ্বাস করো, অন্য পথে শান্তি নেই। তার আগে, কিছু মনে করো না, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমার, তোমার নিজের নামটাও কি তুমি ভুলে গেছ! জিজিয়া কারো নাম হয় কখনো।

রিজিয়া : আমার নাম জিজিয়া নয়, রিজিয়া। আপনি ছাড়া আর কেউ এ রকম ভুল করতে পারত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : (আবার উত্তেজিত) রিজিয়া জিজিয়া কোনোটাই তোমার নাম নয়। তোমার নাম কুলসুম। তোমার ফুফু আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে অনেক আদর করে ঐ নাম ঠিক করেছিলেন।

রিজিয়া : তা হতে পারে। তবে ফুফু আম্মার নাম পাল্টে আমার নিজের আম্মা আমাকে নতুন নাম দিয়েছেন। রিজিয়া খানম।

ইয়াজ : (ক্ষেপে) কেন ? তোমার নাম পাল্টাবার সে কে ? আমি এসব কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

রিজিয়া : আপনি যে দিব্যি ফুফু আম্মার নাম আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা কোন অধিকারে ? যে ফুফু আম্মার সঙ্গে আমার কোনোকালে পরিচয় ছিল না, আমাকে তার নাম দিতে গেলেন কেন ?

ইয়াজ : তোমরা সব উন্মাদ, পাগল, বদ্ধ পাগল। যা মুখে আসে তাই বলে চলেছ। অসম্ভব, এসব আমি আর সহ্য করব না, কিছুতেই না। যা হয়েছে, হয়েছে, আর এক চুল আমি সহ্য করব না। এ আমি সহ্য করব না, করব না, করব না।

রিজিয়া : (দাঁড়িয়ে) আপনার মেজাজ আজকে ঠিক নেই। যে করে হোক একটা ঝগড়া বাঁধাবেনই।

ইয়াজ : (নির্বাপিত এবং করুণ) দোহাই তোমাদের— আমার— আমার অন্যায় হয়েছে। চলে যেও না। একটু বসো। আমার সামনে আরেকটু বসো। এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। দেখলে তো আমি মোটেই বদমেজাজী নই। কোনোরকম অন্যায় জুলুম আমি করতে চাইনি। শুধু— শুধু এইটুকু—বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, আমি তোমার আব্বা— মানে মিষ্টি রিজিয়ার বাবা। শান্ত হয়ে আমার সামনে একটু বসো। আমার দিকে ভালো করে একবার তাকাও। কিছু মনে পড়ছে না ? এইটুকু বয়সেই কত বুদ্ধি ছিল তোমার! সে সময়ের কিছুই মনে নেই তোমার ? এমন কাউকে মনে পড়ছে না যে তোমাকে ভালোবাসত ? পাগলের মতো আদর করত ? তার অফিস-ঘরে টেবিলের ওপর বসে দোয়াত কাগজ ছড়িয়ে একাকার করলেও সে লোকটা কিছু বলত না— বরঞ্চ উল্টো দুষ্টু মেয়েটার সঙ্গে বোকার মতো হাততালি দিয়ে হাসত— ওকে আদর করত— চুমু খেত—

রিজিয়া : ও রকম করে বর্ণনা করলে যে-কোনো জিনিস সত্য বলে ভুল হতে পারে। নইলে এমনিতে কিছু মনে পড়ছে না।

ইয়াজ : তোমার মা এসব ভুলেও কোনোদিন বলেনি ? আমার কথা কি কোনোদিন তোমাদের কানে ওঠেনি ?

রিজিয়া : অন্তত আমার কাছে কোনোদিন বলেনি। ওহ্ হ্যাঁ, একদিন বলেছিল—

ইয়াজ : সত্যি ? কী বলেছিল ?

রিজিয়া : আমাদেরকে বাধ্য রাখার জন্য আপনি নাকি একদিন বাজার থেকে একটা চাবুক কিনে এনেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : ওহ্! সেটা-সেটাই শুধু উল্লেখ করেছে আর কিছু না, না ? সন্তান যেন বাপের দিকে ঘুরেও না তাকায় তার জন্য এত ষড়যন্ত্র! এত বড় শয়তানী!

রিজিয়া : কী ? এত বড় সাহস আপনার ? আমার মায়ের বিরুদ্ধে আর একটা কথাও উচ্চারণ করবেন না আপনি।

ইয়াজ : দেখ মেয়ে, বেশি বাড়াবাড়ি করো না বলে দিচ্ছি। পরে পস্তাবে। ভুলে যেও না আমি তোমার আব্বা।

রিজিয়া : আপনি ইচ্ছে করলে এখন চলে যেতে পারেন।

ইয়াজ : আমাকে একটু দম নেবার সময় দাও। হঠাৎ বুকের মধ্যে দম আটকে আসছে। আহ্! মরে গেলে খুব খুশি হও, না ?

রিজিয়া : (উঠে গিয়ে ডাক দেয়) ডক্টর!

ডাক্তার : (বা'র থেকে) জি।

রিজিয়া : একটু এখানে আসুন। ইয়াজদানী সাহেবকে একটু দেখে যান।

ইয়াজ : না না। কারো দরকার নেই। আমাকে দেখার জন্য কাউকে ডাকতে হবে না। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। কিচ্ছু হয়নি আমার। (কোনো রকমে উঠে দাঁড়ায়) গেলেই যখন খুশি হও, তখন আমি মিছেমিছি আর তোমাদের কষ্ট দেব কেন ? (উঠে দাঁড়ায়) আমাকে আর কিছুই বলতে চাও না, না ?

রিজিয়া : কী বলব ?

[ইয়াজদানী স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর নিজের কোট লাঠি গুছিয়ে চলে যায়। অন্য দিক দিয়ে ঢোকে ডাক্তার]

ডাক্তার : ব্যাপার কী ? বুড়ো কোথায় ?

রিজিয়া : চলে গেছেন।

[ময়দান একবারে খালি দেখে ডাক্তারের চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রিজিয়া নির্বিকার।]

মনে হলো, অসুস্থ, তাই আপনাকে ডেকেছিলাম। কিন্তু উনি অপেক্ষা না করেই চলে গেছেন। আপনাকে খামকা ডেকে আনার জন্য দুঃখিত।

ডাক্তার : ভালোই হয়েছে। ওই বুড়োর মেজাজ আমার সহ্য হয় না । অমন লোকের অমন অপরূপ মেয়ে কী করে হয়, সেটা ভেবে কূল পাই না।

রিজিয়া : (চমকে) এ সব মন-ভুলানো পোশাকী বুলি আমার কাছে ভয়ঙ্কর ক্লান্তিদায়ক। সত্যি যদি অন্তরঙ্গ হতে চান, তবে সহজভাবে বন্ধু হতে চেষ্টা করুন। ভণিতা স্তুতি ওগুলো যদি বর্জন করতে না পারেন তবে আমার পক্ষে আপনাকে কখনো বন্ধু বলে স্বীকার করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া গোড়াতেই আরেকটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখা আমি নিরাপদ মনে করি। বিয়ের আমি ঘোর বিরোধী। কাজেই সবদিক বুঝে শুনেও যদি আমাদের পরিচয়কে জিইয়ে রাখতে চান, ভালো, নইলে আজ বিকেলেই তার যবনিকা টেনে দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (খুব সতর্ক) মেনে নিলাম। কিছু যদি মনে না করেন, তবে একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম। আপনি নীতির দিক দিয়ে বিয়ের বিরোধী, না ব্যক্তিবিশেষকে, যেমন ধরুন, আমার মতো লোককে বিয়ে করার ব্যাপারেই আপনার ঘোরতর আপত্তি।

রিজিয়া : আপনার ব্যক্তিগত যোগ্যতা যাচাই করার মতো ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমাদের হয়নি। কাজেই বিশেষ করে আপনার প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমার বিরোধ নীতিগত। আমাদের সমাজে এখনো দাম্পত্য জীবনের যে রূপটা প্রচলিত, তাতে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো মেয়েই স্বেচ্ছায় কবুল বলতে পারে না।

ডাক্তার : (মুহূর্তে সুর পাল্টে সমাজসেবক বনে যায় এবং রিজিয়ার অপূর্ব দৃষ্টিশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে যায়) আশ্চর্য, এমন একটা জ্বলজ্যান্ত সত্য কোনো মেয়ের মুখ থেকে এই প্রথম শুনলাম। আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আত্মসচেতন কোনো মেয়েরই প্রচলিত বিয়েতে স্বেচ্ছায় মত দেয়া সম্ভব নয়। (গুছিয়ে বসে) মিঠা বুলির ছলচাতুরি আমিও পছন্দ করি না। অথচ আমাদের সমাজের মনই এত কুৎসিত যে, কোনো একজোড়া ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বসে আলাপ করছে দেখলেই আঁতকে ওঠে। শুঁকে শুকে ওর মধ্যে একটা মতলব খুঁজে বার করবেই। যেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনোরকম সুস্থ সম্পর্ক পুরুষ আর নারীর মধ্যে থাকতে পারে না। মেয়েদের এরা এত ছোট মনে করে!

রিজিয়া : (কৌতূহলী) কী অদ্ভুত বিচার! আপনার কথা শুনে এখন ভরসা হচ্ছে, হয়তো সহজ স্বাভাবিক মানুষের মতো আপনি চলতে পারবেন।

ডাক্তার : (উৎসাহিত স্বীকার) একশ বার। আমরা যদি তেমন করে এগুতে না পারি, তাহলে চলবে কেন? ভাবতে বড় ভালো লাগছে যে, এই কুসংস্কারে-ভরা দুনিয়ায় অন্তত দুটি মুক্তবুদ্ধি তরুণ-তরুণী নিজেদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছে। পথ চলতে হঠাৎ এমন একটা কুয়াসাহীন ঝকঝকে মনের সাক্ষাৎ পাব, এ আমি কোনোদিন ভাবিনি।

রিজিয়া : বর্মা থেকে যখন আমরা এদেশে আসি, তখন আমরা কিন্তু আশা করেছিলাম, বাংলাদেশে নিশ্চয়ই তেমন মানুষের অভাব হবে না।

ডাক্তার : মানুষ এখানে অনেক আছে— অনেক— কোটি কোটি। কিন্তু আপনার ঐ বর্মীরও অধম এরা।

রিজিয়া : ওদের কথা আর বলবেন না। সব গবেট। কুসংস্কারের ডিপো। মেরুদণ্ডহীন আবেগের ফানুস। জানেন, দুর্বলকে আমি ঘৃণা করি। আর আবেগকে ঘৃণা করি তার চেয়েও বেশি।

ডাক্তার : সেই ঘৃণাই আপনার ব্যক্তিত্বকে করেছে অতি দ্যুতিময়।

রিজিয়া : (হাসতে হাসতে) দ্যুতিময়?

ডাক্তার : নিশ্চয়ই। বিদ্যুতের মতো প্রবহমান। আপনার ভেতরের শক্তি চারপাশ স্পর্শ করে তড়িৎরেখার মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিজিয়া : দুর্বলকে নিয়ে কৌতুক করছেন এবার ?

ডাক্তার : মিথ্যে কথা। কাকে দুর্বল বলছেন ? মূর্তিময়ী শক্তি আপনি। জানেন, আজ সকালে কে এসে আমার সমস্ত পুরনো দুনিয়া মুহূর্তে ওলট-পালট করে দিল ? আজ সকালেও আমি ছিলাম হতাশায় আচ্ছন্ন, অন্ধ, অচেতন। সারা মন জুড়ে ছিল শুধু ঘর ভাড়ার বিভীষিকা, ভবিষ্যতের অন্ধকার, বর্তমানের ব্যর্থতা। হঠাৎ দেখলাম আপনাকে। চোখ ঝলসে গেল। (রিজিয়ার ভ্রূতে সন্দেহের মেঘ। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে সামলে নেয়।) মাফ করবেন, কথাটা বড্ড খেলো হয়ে গেল। কিন্তু সত্যি সত্যি সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে কিছু একটা ঘটে গেল। আপনাকে হয়তো ঠিক বোঝাতে পারছি না। নিঃশ্বাসের এক ঝলকে আমার রক্তে তখন— মানে (একটা আবেগহীন শব্দের তল্লাশে) মানে— অক্সিজেনের প্রাবল্যে রক্তে এক আকস্মিক দাহ-ছিটকে সরে গেল শৈথিল্য-অনুভব করলাম একটা বলিষ্ঠ সবল প্রত্যয়। শুনে আপনি যতখানি অবাক হচ্ছেন, ভেবে ভেবে আমিও ততখানি দিশেহারা। এমন যুক্তিহীন কাণ্ড, আমার জীবনে ঘটতে পারে স্বপ্নেও তা ভাবিনি।

রিজিয়া : (অস্বস্তি) বাগানে চলুন, ওরা হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ডাক্তার : (রহস্যময়) তাহলে কি আপনার চেতনায়ও সেই ছায়া পড়েছে ?

রিজিয়া : কিসের ছায়া ?

ডাক্তার : আতঙ্কের।

রিজিয়া : আতঙ্ক ?

ডাক্তার : হ্যাঁ।—একটা কিছু অনিবার্যভাবে এগিয়ে আসছে, তার ভয়। আপনি যে মুহূর্তে বাগানে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে কী একটা অজানা ভয়ে আমারও মনে হচ্ছিল, যত শিগগির পারি, দু'জনে পালিয়ে গিয়ে সকলের মধ্যে আশ্রয় নিই।

রিজিয়া : (অবাক হয়ে) আশ্চর্য! আশ্চর্য! আমারও ঠিক সেইরকমই মনে হচ্ছিল।

ডাক্তার : (গম্ভীর) সত্যি অবাক হবার কাণ্ড! (দাঁড়িয়ে) তাহলে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের সিদ্ধান্তই কি গ্রহণ করছি ?

রিজিয়া : কী বললেন, অসম্ভব! পালাব কেন ? ভয়ে হার মানার মতো ছেলেমানুষী আর কিছু নেই। (আঁট হয়ে বসে। ডাক্তারও বসে পড়ে। গম্ভীর চোখে রিজিয়াকে দেখে। রিজিয়ার কপালে গাঢ় চিন্তার রেখা) আচ্ছা মনের এসব আকস্মিক খেয়ালের কোনো ব্যাখ্যা কি বিজ্ঞান দিতে পারে না ?

ডাক্তার : কে জানে ? হয়তো পারে, হয়তো পারে না। গোটা অনুভূতিটাই এত অদ্ভুত— এত অসহায়— এত—

রিজিয়া : (চমকে, সজাগ) অসহায় ?

ডাক্তার : অসহায় নয় তো কী ? প্রকৃতি আমাদের আলাদা সত্তা দান করেছে, বুদ্ধি দিয়েছে বিচার করার জন্য, তারপর এক সময় হঠাৎ ছোঁ মেরে দু'জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণত মানুষকে তুলে নিয়েছে নিজের বিশাল হাতের মুঠোয়। একেবারে টুটি চেপে তুলে ধরে নিয়েছে। যেন অতি ক্ষুদে দুটি জীব—তারপর আমাদেরকে নিয়ে যা খুশি তাই করছে, যা খুশি তাই করাচ্ছে। এর চেয়ে অসহায় আর কী হতে পারে।

রিজিয়া : এতদূর আপনার কল্পনার দৌড় ছাড়া আমি পৌঁছতে পারতাম না, কি বলেন ?

ডাক্তার : (হঠাৎ, একবারে) জানি না, জানার ইচ্ছেও নেই। জানলেও পরোয়া করি না। (গভীর অভিযোগে ফেটে পড়ে) মিস আহসান! মিস আহসান! এ আপনি কী করছেন ? ও আপনি কেন করলেন— কেন ? কেন ?

রিজিয়া : মানে— আমি— আমি কী করেছি আবার ?

ডাক্তার : এ মায়া, এ স্বপ্নে, এ মোহে আপনি কেন আমায় জড়ালেন ? বিশ্বাস করুন, আমি সর্বক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টা করেছি সুস্থ থাকতে সহজ হতে। সাধ্যমত আঁকড়ে ধরেছি আমার বৈজ্ঞানিক চেতনাকে। কিন্তু সাধ্য কী আমার যে আমি অন্যপথে চলি! আপনি, আপনি যে আমার সুপ্ত চেতনায় জাগ্রত কল্পনা সঞ্চার করেছেন। সে দোষ কি আমার!

রিজিয়া : দোহাই আপনার, আর এগুবেন না। এরপর হয়তো আরও বোকার মতো, একেবারে চরম অশ্লীলতার পরিচয় দিয়ে বলে বসবেন, এর নামই ভালোবাসা।

ডাক্তার : ছি ছি ছি! কী যে বলেন। প্রেম! যেন আমরা এখনো এতই ছেলেমানুষ রয়ে গেছি! বরঞ্চ একে বলুন কেমিস্ট্রি। প্রকৃতির অমোঘ আঘাত, তার অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রকাশ! এটা তো আর অস্বীকার করতে পারবেন না যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভয়ানক ভয়ানক পরিবর্তন সাধিত হয় অত্যন্ত সহজে। তাই হয়েছে। আপনি আমাকে আকর্ষণ করছেন প্রচণ্ডভাবে, এবং সে শক্তির রূপ মূলত রাসায়নিক!

রিজিয়া : নন্‌সেন্স। (আবেগ) কী সব আবোল তাবোল বকছেন ?

ডাক্তার : নিশ্চয়ই আবোল তাবোল বকছি। একেবারে নিরেট বোকা না হলে আরো আগেই সেটা বুঝতে পারতেন। (রিজিয়া হতভম্ব) হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি।—আপনি একটা বোকা মেয়ে। আপনি যে কেবল বোকা তাই নয়— আপনি উন্নাসিকও। খুশি হয়েছেন ? (উঠে পড়ে) আশা করি, এরপর নিশ্চয়ই আর আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রইল না।

রিজিয়া : (হিমকঠিন মুখে, যেন স্কুল-মাস্টারনি ফটো তুলতে বসেছে) মস্ত বড় ভুল করলেন। আমাকে যে আপনি এত কম বোঝেন, তারই চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। আপনার কথায় আমি একটুও চটিনি। (ডাক্তার আস্তে আস্তে আবার বসে পড়ে) আমার স্বভাবের ত্রুটি বন্ধুরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিক, এটা আমি বরাবরই চাই। এমনকি তারা যদি আপনার মতো ভুলও করে, তবুও। কিন্তু আমি উন্নাসিক, সারা বর্মা মুলুকেও এমন কথা কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোদিন বলেনি।

[ঠোঁট চেপে স্থির অগ্নিময় চোখে ডাক্তারের দিকে তাকায়]

ডাক্তার : (সেয়ানে সেয়ানে) আমি যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। আমার বুদ্ধি, বিবেক, অভিজ্ঞতা সব কিছুই বলছে অহমিকায় আপনি তুলনাহীনা।

রিজিয়া : তাহলে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কারোই বুদ্ধি, বিবেক আর অভিজ্ঞতা ভ্রান্তিহীন নয়। অন্তত আপনারটা যে নয়, সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

ডাক্তার : তবু আমাকে সেগুলোর ওপর আস্থা রেখেই বেঁচে থাকতে হবে। আপনি কি চান, তার বদলে, এই মুহূর্তে আমার চোখ, মন, স্নায়ু, কল্পনা আমাকে বারবার যেসব অসম্ভব আবেশে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, সেগুলোকে বিশ্বাস করি, সেই সব মিছে কথায়?

রিজিয়া : (অসর্তক কৌতূহল) কি মিছে কথা?

ডাক্তার : হ্যাঁ, মিথ্যে কথা নয়তো কী! আপনি কি মনে করেন সারা দুনিয়ায় আপনি একজন সেরা সুন্দরী, রূপসী— এ কথাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

রিজিয়া : প্রশ্নটা উদ্ভট এবং নিতান্তই ব্যক্তিগত।

ডাক্তার : এবং অবিশ্বাস্য। অথচ আমার এই চোখ বারবার এই একই বার্তা বয়ে আনছে। (রিজিয়া হুঁশিয়ার হয়ে ভ্রূ কুঁচকায়) ভয় নেই। ভুলেও মনে করবেন না যে আপনাকে তোষামোদ করতে বসেছি। কারণ আমার চোখকে আমি বিশ্বাস করি না। (রিজিয়া মনে মনে লজ্জিত হয় এইজন্য যে এই অস্বীকার তাকে কোনো আনন্দ দেয় না) আপনি কি মনে করেছেন যে আমার দুর্বলতাকে গভীর অবজ্ঞায় ত্যাগ করে আপনি যখন চলে যাবেন, আমি তক্ষুণি ছোট ছেলের মতো মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে দেব?

রিজিয়া : (গলার কাঁপুনি যেন কিছুতে ধরা না পড়ে সেই চেষ্টা) কাঁদবেন, কাঁদবেন কেন?

ডাক্তার : নিশ্চয়ই না। কাঁদব কেন? এতই আহাম্মক পেয়েছেন আমাকে? তবু আমার হৃদয় বলছে, কাঁদা উচিত। আমার আহাম্মক হৃদয়! ভয় নেই, আমি তবু কাঁদব না। হৃদয়কে আমি এমনি ছেড়ে দেব ভেবেছেন? ওর সঙ্গে আমি তর্ক করব। যুক্তি দিয়ে ওকে আমি পোষ মানাবই। আপনাকে হাজারগুণ ভালোবাসলেও সত্যের সঙ্গে মোকাবেলা করতে ভয় পাব না। নিজেকে বাধ্য করব। পাগল না হয়ে যাওয়াটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। বাস্তবকে আঁকড়ে ধরতে হবে, সেখানে ফাঁকি চলবে না। এখন কোথায় আমি? স্বর্গে নয়, ম্যারাইন হোটেলে। সময়? অন্ততকাল নয়, বিকেল ছটা। আমি কে? দাঁতের ডাক্তার, পাঁচ পাঁচ রূপেয়ার!

রিজিয়া : আর আমি, আমি? এমন একটি মেয়ে অহমিকায় যে তুলনাহীনা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (আবেগে) কে, কে বলেছে ? অথচ বাস্তবতা আমি চাই না। দোহাই আপনার ঐখানটাতে একটু মায়া থাকতে দিন! মিস্ খানম, আমি আপনাকে ভালোবাসি। (সতর্ক রিজিয়া সরে যায়। শিউরে উঠে ডাক্তার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) আহাম্মক! ঘোর আহাম্মক আমি! আপনি আমাকে এক বিন্দুও বোঝেননি। এতক্ষণ ধরে নদীর পাড়ে গিয়ে কচুরিপানার সঙ্গে তর্ক করলেও বোধহয় এর চেয়ে বেশি প্রতিদান পেতাম। [চলে যাবার জন্য তৈরি হয়]

রিজিয়া : (করুণা) যা হয়েছে আমি তার জন্য দুঃখিত। আপনার জন্য সত্যি আমার সহানুভূতিও রয়েছে। কিন্তু এ রকম ব্যাপারে আমি-আমি নাচার।

ডাক্তার : (ফিরে আসে। ব্যবহারে চিত্তজয়ী বেপরোয়া সাবলীল বিনয়) সে জন্য আপনি দুঃখিত হবেন কেন ? অন্যায় করেছি আমি, অপরাধ আমার। দুর্ভাগ্যও বলতে পারেন। আমাকে আপনার সহজভাবে ভালো লেগেছিল। আমি বোকার মতো সব তালগোল পাকিয়ে সব একাকার করে দিলাম। (রিজিয়া বাধা দিতে চেষ্টা করে) ওহ্! নয়া জামানার মুক্তবুদ্ধি তন্বী আপনি, বুদ্ধি-বিবর্জিত মনের ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগার কথাও হয়তো আপনাদের স্বীকার করতে নেই।

রিজিয়া : (স্বাধীন রমণী) স্বীকার করতে পারব না এমন নিয়ম হতে পারে না। নিয়ম মেনে মাথা নাড়াবার অভ্যেস আমার নেই। যা মনের মধ্যে সত্য বলে জানব তা একশ'বার মুখেও বলব।

ডাক্তার : (আতঙ্কিত) দোহাই আপনার, বলবেন না। সহ্য করতে পারব না।

রিজিয়া : আপনার মধ্যে যথেষ্ট আবেগ রয়েছে, এটা সত্য। আপনি যথেষ্ট বোকাও। তবে লোক হিসেবে আপনি মন্দ নন।

ডাক্তার : (বড় চেয়ারে মুষড়ে পড়ে) আমারও তাহলে এখানেই সব শেষ। স-ব! (মূর্তিমান অন্তিম মুহূর্ত)

রিজিয়া : (বিব্রত, এগিয়ে আসে) সে-কী ? এসব কী বলছেন ? কেন বলছেন ?

ডাক্তার : শুধু মন্দ না হওয়াই কি যথেষ্ট ? আর কিছু নয় ?

রিজিয়া : (একটু আবেগ, অনেকটা দরদ দিয়ে তাকিয়ে) আমি দুঃখিত।

ডাক্তার : (গভীর আবেগে) থাক্, থাক্, দোহাই তোমার। আর যাই করো করুণা করো না। তুমি জান না, তোমার ঐ কণ্ঠস্বর আমার হৃদপিণ্ডকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও রিজিয়া! প্রবেশ করেছ এ হৃদয়ের অতল গহীনে— তারপর এ-কী নির্মম জ্বালা— কী মাতামাতি! আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারছি না রিজিয়া।

রিজিয়া : (ভেঙে পড়ে) চুপ করো। আর বলে বোঝাতে হবে না তোমাকে। আমি সহ্য করতে পারছি না।

ডাক্তার : (বিজয়গর্বে এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। আবেগে অবরুদ্ধ কণ্ঠে তীব্র উল্লাস ধ্বনি) উহ্! এতক্ষণে ধরা দিয়েছ। ভাগ্যিস্ সাহস করেছিলাম! (নাক ধরে নাড়া দেয়। মাথার চুল এলোমেলো করে দেয়।) দুর্জয় সাহসে মেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে। (রিজিয়ার হাত দু'হাতে জাপটে ধরে চুমু খেয়ে ফেলে। হতবাক রিজিয়ার সামনে কিশোর বালকের মতো খল খল হাসতে হাসতে) অবশেষে রিজিয়া খানম, তুমিও পড়লে ? সব খতম। রিজিয়া, আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়েছি। (স্তম্ভিত রিজিয়া ঢোক গেলে) বাপরে বাপ, যা একটা ডাইনী মেয়ে তুমি! ভয়েই যদি কাবার হয়ে যেতাম ?

কিসু : (বা'র থেকে গলা শোনা যায়) হ্যালো— ডক্টর— ডক্টর—

বেনু : ডক্-ট-অ-র!

ডাক্তার : আমি পালাই এবার!

[তাড়াতাড়ি করে হাতে চুমু খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় মা প্রবেশ করে। রিজিয়া অর্ধঘুমন্ত স্তব্ধতা নিয়ে যে-কোনো দিকে তাকিয়ে থাকে।]

মা : খোরশেদ, ছেলেমেয়েরা তোমাকে বাগানে ডাকছে। (চারিদিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি মেলে) উনি কি চলে গেছেন ?

ডাক্তার : কে ? ওহ— মানে— হ্যাঁ। মি. ইয়াজদানী অনেকক্ষণ হয় চলে গেছেন।

[প্রস্থান]

রিজিয়া : (সোজা আঁকড়ে ধরে) মা!

মা : (উদ্বেগে জড়িয়ে ধরে) সে-কী ? কী হয়েছে মা ?

রিজিয়া : এ তুমি কেমন করে মানুষ করেছ আমাদের ? সব কিছু তুমি আমাদের শেখালে না কেন মা ?

মা : ছিঃ রেজু! এসব কী বলছিস! তোর মা কি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেছে ?

রিজিয়া : না— তুমি আমাদের কিছু শেখাও নি— কিচ্ছু না!

মা : কী হয়েছে তোর ? খুলে বল।

রিজিয়া : ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা! কী লজ্জা! কী লজ্জা!

[দু'হাতে মুখ ঢেকে মা'র দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।]

পর্দা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অঙ্ক

[ম্যারাইন হোটেলে বেগম রোকেয়া আহ্সানের বসবার ঘর। প্রশস্ত এবং আরামদায়ক। মাঝখানে একটা বড় গোলটেবিল। এ-কোণে ও-কোণে অন্যান্য ছোট টেবিল ও চেয়ার।

এক কোণে বেগম রোকেয়া নিজের নতুন রচনার প্রুফ দেখছেন। জানালার কাছে রিজিয়া-চোখে চিন্তা ও যন্ত্রণার ছাপ। ঘড়িতে ঢনঢন করে সাতটা বাজল।]

মা : সাতটা বেজে গেল ? কিসু-বেনুর জন্য অপেক্ষা করে আর দরকার নেই। ওরা নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কোথাও চা খেয়ে আসবে।

রিজিয়া : (ক্লান্ত) চা দেবার জন্য ডাকব ?

মা : ডাকো। (রিজিয়া দরজার কাছে এসে কলিংবেল টেপে।) তবু যা হোক এতক্ষণে এই প্রুফ শেষ হলো।

রিজিয়া : (বেখেয়ালে) কিসের প্রুফ মা ?

মা : বাঃ, কতবার বললাম তোমাকে। 'বিংশ শতাব্দীর নারী'র নতুন সংস্করণ বা'র হচ্ছে যে!

রিজিয়া : (তেতো হাসি) ও! কিন্তু একটা পরিচ্ছেদ বাদ পড়ে গেছে।

মা : বাদ পড়ে গেছে ? অর্থ ? কোন পরিচ্ছেদ ? (কাগজ ঘাটবে।)

রিজিয়া : না না, যেগুলো তুমি লিখেছ, ঠিক রয়েছে সেগুলো। যে পরিচ্ছেদটা এখনো লেখা হয়নি, আমি সেটার কথা বলছিলাম। হয়তো তোমার হয়ে পরিচ্ছেদটা আমি না হয় পরে জুড়ে দেব— অবশ্য নিজে যদি সবটা পুরোপুরি বুঝতে পারি, তবেই।

মা : রিজিয়া, কী বলছ তুমি ?

রিজিয়া : থাক। এমনি বলছিলাম।

মা : (বিব্রত এবং উত্তেজিত। একটু তাকিয়ে থেকে) রিজিয়া !

রিজিয়া : কী মা ?

মা : কাউকে প্রশ্ন করে কথা বা'র করা আমার স্বভাব নয়।

রিজিয়া : (হঠাৎ মা'র কাছে এসে) সে কি আমি জানি না মা!

[আচমকা দু'হাত দিয়ে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে]

মা : (হাসছে কিন্তু যথেষ্ট বিব্রতও) সে কী রেজু মা, এ যে একেবারে ভাবাবেগের বন্যা! বড় সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছ।

রিজিয়া : (আঁতকে উঠে) কী বললে ? না না, ও কথা বলো না আমাকে!

[মার কাছ থেকে টেনে নিজেকে অন্যখানে নিয়ে যায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : (দরদে) রেজু মা, কী হয়েছে, খুলে বল।

সৈয়দ : (দোরগোড়া থেকে) আমাকে চায়ের জন্য ডেকেছিলেন ?

মা : হ্যাঁ।

সৈয়দ : (চায়ের সাজানো ট্রে নিয়ে ঢুকে পড়ে। টেবিলে গুছিয়ে রাখতে রাখতে ঘন্টা শুনে আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আমি অনেককে জানি, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে না পারলে এসপার ওসপার করে দেন।—ভাইবোনের জোড়কে দেখলাম নদীতে নৌকা বাইছেন। এক্ষুণি ফিরবেন। বিকেলে নদীর ওপরে হাওয়া বড় মিঠা। স্বাস্থ্যের জন্যও খুব ভালো।—আসাদুল্লাহ চৌধুরী সাহেবের আজ আসতে একটু দেরি হবে। উনি বলেছেন যে মিস্টার ইয়াজদানীর ওখানে হয়ে তারপর আসবেন।

রিজিয়া : (ঘরের চারিদিকে ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে) আর সঙ্গের ঐ ভদ্রলোক, উনি ?

সৈয়দ : (যেন বেখেয়ালে গীত গাইছে) উনি ? আসবেন, আসবেন বৈকি! হ্যাঁ উনিও আসছেন। মানে, উনি তো অনেকক্ষণ ধরে এসেই রয়েছেন। ওদের সঙ্গে নৌকা বাইছিলেন। দাঁড়ের ঘায়ে কী একটা সামান্য চোট পেয়েছেন, তাই মোড়ের ডাক্তারখানায় গিয়েছেন ওষুধ লাগিয়ে আসবেন বলে। ওখান থেকে সোজা চলে আসছেন।

[রিজিয়া একটা অব্যক্ত আতঙ্কে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।]

মা : রিজিয়া !

[কিন্তু ততক্ষণে রিজিয়া ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। একটু বিচলিত হয়ে মা অসহায় মুখ তুলে ওয়েটারের দিকে তাকায়। ওয়েটার সম্পূর্ণ অবিচলিত]

সৈয়দ : আর কিছু এনে দেব ?

মা : অ্যাঁ ? না, থাক।

সৈয়দ : শুকরিয়া।

[ওয়েটার বেরিয়ে যাবার পথে দরজা খুলেই একপাশে সরে দাঁড়ায়, ছুটে ঘরে ঢুকে বেনু, কিসু। তারপর ওয়েটার নিঃশব্দে দরজা টেনে দিয়ে চলে যায়।]

বেনু : (রাক্ষসী) চা চা চা কোথায় ? (চায়ের পট খাবলে নেয়) জানো মা, নৌকা চড়েছি আজ। খোরশেদ ভাইও সঙ্গে ছিল। এক্ষুণি আসবে।

কিসু : ও লোকটা একেবারে আনাড়ি। দাঁড় পর্যন্ত টানতে জানে না। রিজিয়া, কোথায় গেল ?

মা : (চা ঢালতে ঢালতে, সাবধানে) একটা কিছু ওর হয়েছে কিসু। কী হয়েছে তা আমি জানি না। তোমরা যদি কিছু জানো, আমায় বলতে পার। (বেনু ও কিসু পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে।) কী হয়েছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসু : কিছুই না। সেই প্রাচীন কাহিনী। রোমিও—

বেনু : এবং জুলিয়েট।

কিসু : (চা গিলতে গিলতে) কিছু না মা, সেই মান্ধাতার আমলের পুরনো কেসসা।—এই বেনু, সবটা নিয়ে নিস না। (ছোঁ মেরে নিপুণভাবে দুধের পটটা দখল করে) একই কাহিনী। কোনো এক অপরূপ বসন্তে—

বেনু : কোনো এক তরুণের স্বপ্নকামনা—

কিসু : অবশেষে ঠেকল এসে-একটা বিস্কুট-প্রেমের চড়ায়! অনুরূপ ঘটনা হেমন্তেও ঘটতে পারত। ইতিহাসে তারও নজির আছে। আমাদের এই বিশেষ কাহিনীর নায়ক হলেন—

বেনু : ডক্টর খোরশেদ হোসেন।

কিসু : নায়িকা আমাদেরই মহামান্য জ্যেষ্ঠা ভগিনী। এবং সে প্রেম চড়ায় ঠেকে থাকেনি। গড়িয়েছেও অনেক দূর পর্যন্ত।

বেনু : একেবারে প্রকাশ্য অলিন্দে—

কিসু : স্বচক্ষে দেখেছি।

বেনু : স্বকর্ণে শুনেছি।

কিসু : এবং মনে হলো, জুলিয়েটও মুগ্ধ, অভিভূত!

মা : বেনু, কিসু, তোমরা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? অসম্ভব! রিজিয়া এসব সহ্য করল?

কিসু : আড়াল থেকে আমরা ভাবছিলাম এই বুঝি রেজুবুর রোষবহ্নি বেচারা ডাক্তারকে ভস্মীভূত করে ফেলে!

বেনু : কিন্তু কিছুই ঘটল না।

কিসু : উল্টো মনে হলো রেজুবুর যেন সবটা ব্যাপার ভালোই লাগছিল!

বেনু : অন্তত নিরাপদ দূরত্ব থেকে আমাদের তো সেই রকমই মনে হয়েছে। (থাবা দিয়ে কিসুর কাছ থেকে চায়ের পট ছিনিয়ে নেয়) হয়েছে দু পেয়ালা সাবড়েছ, এবার আমাকে ছেড়ে দাও।

মা : (বিচলিত) আচ্ছা দ্যাখো, খোরশেদ আসা মাত্রই, তোমরা এ ঘর থেকে চলে যাবে। ব্যাপারটা যথেষ্ট গুরুতর। এ নিয়ে ওর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা হওয়া দরকার।

কিসু : কেন? ওর আসল মতলব কী, সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য? কিন্তু মা! সেটা করা কি বিংশ শতাব্দীর নীতিধর্ম-বিরোধী হবে না?

বেনু : ওসব কথায় কান দিও না, মা। ও মিয়ার কাছ থেকে কড়া কৈফিয়ত তলব কর। উনবিংশ শতাব্দী তো আর এখনো একেবারে মরে যায়নি! সেইটে দিয়েই যেমন করে পার বান্দাকে ঘায়েল করে দাও।

[ডাক্তারের আগমন ধ্বনি]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিসু : চুপ। আসছে।

ডাক্তার : (ঢুকতে ঢুকতে) আমার বড় দেরি হয়ে গেল, না ? (মা'কে) চোট বেশি লাগেনি। তবে দু-একদিন বোধহয় ভোগাবে। সব শুনেছেন বোধহয় এতক্ষণে ?

কিসু : স-ব!

বেনু : একেবারে টীকাটিপ্পনী সহ।

কিসু : না করে উপায় ছিল না। কর্তব্যবোধ। বেনু, চল আমরা যাই।

[ভাইবোন করুণ দৃষ্টি দিয়ে অসহায় ডাক্তারকে দেখতে দেখতে হাত ধরাধরি করে চলে যায়।]

মা : দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বসো। যদি আপত্তি না থাকে তবে তোমাকে খোলাখুলি দু'একটা কথা বলব। প্রথমেই অবশ্য এ ব্যাপারে আমার নিজের অযোগ্যতার কথা স্বীকার করে নিচ্ছি। যা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাইছি, সে সম্পর্কে আমার নিজের জ্ঞান খুবই পরিমিত— বলতে পার একেবারে নেই।

ডাক্তার : আপনি কী বলতে চাইছেন ?

মা : আরো স্পষ্ট করে বলতে হবে ? আমার তো মনে হয় তুমি বুঝতে পেরেছ।

ডাক্তার : রিজিয়া ?

মা : হ্যাঁ, রিজিয়া।

ডাক্তার : (একেবারে সরাসরি) বেশ। আমি ওকে ভালোবাসি। (মাকে বাধা দিয়ে) আপনি কি বলতে চান, তাও বুঝতে পেরেছি। আমার কোনো আর্থিক সঙ্গতি নেই। এই তো ?

মা : না। টাকাটাকে কখনো আমি বড় করে দেখিনি।

ডাক্তার : আশ্চর্য তো! বিবাহযোগ্যা কোনো মেয়ের মাকেই আজ পর্যন্ত এতটুকু উদার হতে আমি দেখি নি। আপনি একটা ব্যতিক্রম।

মা : কথা শুনে মনে হচ্ছে অনেক দেখেছ। (ডাক্তার কি একটা বলার জন্য মুখ খুলছে) থাক, আর সাফাই গাইতে হবে না। যতই কম বুঝি না কেন, নিজের সহজ বুদ্ধিটা আর খুইয়ে বসিনি। যে লোক রিজিয়ার মতো মেয়েকে এতদূর দুর্বল করতে পারে সে লোক এসব ব্যাপারে নিতান্ত কাঁচা নয়, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ডাক্তার : বিশ্বাস করুন—

মা : (বাধা দিয়ে) তোমাকে সে জন্য দোষ দিই না। রিজিয়া পরিণত বয়সের মেয়ে, নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার নিজের। নিজের সাময়িক খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য যে-কোনো মেয়েকে নিয়ে কৌতুক করার তোমারও অধিকার আছে। যার যার দায়িত্ব—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (বাধা) আপনি আমাকে অপমান করছেন। সাময়িক খেয়াল কাকে বলছেন আপনি ?

মা : (আবেগ) খোরশেদ, আমি ওর মা। আমাকে ধোঁকা দিও না। তুমি সত্যি সত্যিই কি হৃদয় দিয়ে ওকে ভালোবাস ?

ডাক্তার : (মরিয়া) শপথ করে বলতে পারি— সমস্ত হৃদয় দিয়ে। কোনোরকম দ্বন্দ্ব, কোনোরকম আবিলতা নেই।

[মা এক দৃষ্টিতে ডাক্তারকে ছেঁকে দেখে। হঠাৎ ডাক্তারের রসবোধ সব গাম্ভীর্য পণ্ড করে দেওয়ার জন্য চাড়া দিয়ে ওঠে এবং ফস করে অদ্ভুত গলায় বলে ফেলে]

কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন— প্রত্যেকবারই আমার এ রকম মনে হয়েছে। সজ্ঞানে কাউকেই কোনোদিন আমি ঠকাতে চাই নি। প্রত্যেকবার মনে হয়েছে, এইটেই বুঝি সেই আরাধ্য স্বপ্ন, সেই চরম লক্ষ্য, পরম অনুভূতি। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত বলার কিছুই নেই আমার— দেখতেই পাচ্ছেন।

মা : হুম্। ভালো করেই দেখতে পাচ্ছি। গোড়াতেই আমার সে রকম সন্দেহ হয়েছিল। মেয়েদের মন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, তুমি তাদের দলের।

ডাক্তার : আপনার কী বক্তব্য, তা বুঝতে পেরেছি। (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনাদের সঙ্গে এইটেই আমার শেষ সাক্ষাৎ হোক, এই-ই বোধহয় আপনি চান ?

মা : না, ভুল করলে। তোমাকে আরো পুরোপুরি জানার মধ্যেই এখন রিজিয়ার নিষ্কৃতির শ্রেষ্ঠ পথ।

ডাক্তার : (আতঙ্কিত) এ সব কী বলছেন আপনি! আপনি সত্যি সত্যি তাই মনে করেন নাকি ?

মা : নিশ্চয়ই। কারণ, শিশুকাল থেকে আমি যে শিক্ষায় ওদের মন গড়ে তুলেছি, তার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।

ডাক্তার : (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে) ওহ্! তার ওপর ভরসা করে বসে আছেন ?

[নিশ্চিন্ত মৃদুহাসি নিয়ে শান্ত হয়ে বসে পড়ে]

মা : (ওর নির্লিপ্ত ভাব দেখে ক্ষেপে যায়) কী বলতে চাও তুমি ?

ডাক্তার : যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমিও আপনাকে দু'একটা নতুন কথা শোনাতে পারি।

মা : বেশ, যে কারো থেকেই নতুন জিনিস জানার আমার আগ্রহ সমান।

ডাক্তার : আগ্নেয় অস্ত্রের সমরকৌশল সম্পর্কে কিছু জানেন ? কামান, বন্দুক, গোলাগুলি, রণতরী, আধুনিক রণাঙ্গনে এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মনে কোনো কৌতূহল জাগে কি ?

মা : রিজিয়ার সঙ্গে এসব গোলাগুলির কোনো সম্পর্ক আছে ?

ডাক্তার : আছে এবং বহুল পরিমাণে। অবশ্য তুলনামূলক সূত্রে। গত এক শতাব্দী ধরে আগ্নেয় অস্ত্রের যে অগ্রগতি ঘটেছে তার মূলে রয়েছে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক দল চেয়েছে বারুদপোরা গোলাকে চরম শক্তি দান করতে। অন্যদল চেয়েছে সেটা ঠেকাবার বর্মকে তার চেয়ে মজবুত করে তুলতে। যেই কঠিনতম কামানের গোলাকে অবহেলা করতে পারে এমন জাহাজ তৈরি হলো, অমনি পরের দিনই আবিষ্কৃত হলো ভয়ঙ্করতর কামান। তৈরি হলো আরেকটা জাহাজ যেটা আগেরটার চেয়েও বেশি মজবুত। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো আরও আরও ভয়ঙ্কর কামান, ডুবল তরী। এমনি করেই একটা অন্যটাকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেছে। নর-নারীর মল্লযুদ্ধের ইতিহাসটাও অবিকল ওই রকম।

মা : নরনারীর মল্লযুদ্ধ ?

ডাক্তার : জি। কথাটা আপনার কাছে নতুন ঠেকছে ? এই দ্বন্দ্বের কথা আগে শোনেননি ? এখানে তো এটা পুরনো হয়ে গেছে। পুরুষের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করার জন্য সেকেলে মেয়েকে গড়ে তোলা হতো সেকেলে শিক্ষায়। ফল কী হলো ভালো করেই জানেন। সেকেলে পুরুষ সেকেলে মেয়েকে সহজেই কাবু করে ফেলত। মেয়েকে বাঁচাবার জন্য মায়েরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন নতুন পথ খুঁজে বের করতে, মেয়েকে এমন বর্ম দান করতেন সেকেলে পুরুষ যার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। ঠিক হলো মেয়েকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় গড়ে তোলা যেমন আপনি করেছেন। সেকেলে পুরুষ প্রমাদ গুনল। নিজে ঘায়েল হয়ে যাওয়াতে শুরু করে দিল ঘোর চ্যাঁচামেচি। সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এ নব্যচালচলন মাতৃজাতিকে আদৌ শোভা পায় না, সমাজে ডেকে আনবে অমঙ্গলের বান ইত্যাদি। কিন্তু কোনো ফল হলো ? কোনো মেয়ে তার কথা শুনল না। বাধ্য হয়ে তখন তাকে আক্রমণের প্রাচীন পন্থাসমূহ বর্জন করতে হলো। ত্যাগ করতে হলো সেই পদপ্রান্তে নতজানু বসে, চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা সাক্ষী রেখে মিথ্যা শপথগ্রহণের কৌশলকে।

মা : পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে মেয়েরাই নিবেদন জানিয়ে এসেছে জানতাম।

ডাক্তার : হয়তো হবে। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। হয়তো মেয়েরাই ও রকম করত। সে যাই হোক, আমাদের নতুন পুরুষ কি করল জানেন ? আগ্নেয় অস্ত্রের কারিগর যা করেছিল ঠিক তাই— মেয়েদেরকে ডিঙিয়ে আরেক কদম এগিয়ে গেল। সংগ্রহ করল নতুন লড়াইয়ের নতুন হাতিয়ার। সেও নিজেকে গড়ে তুলল বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়, তারপর জয় করল নব্য নারীদের, ঠিক যেমন করে প্রাচীন যুগের পুরুষ, আয়ত্তাধীন রেখেছিল প্রাচীন যুগের মেয়েকে, প্রাচীন কৌশলে। নয়া জামানার তন্বীদের ফাঁদে ফেলার সব তরিকাই আজকের পুরুষ আবিষ্কার করে ফেলেছে অনেক দিন আগে। কাজেই আমার পন্থা যে আধুনিকতম এবং অপরাজেয় হবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

মা : (ভ্রু কুঁচকে) হুম্। তোমার চালচলনে আমি একটুও অবাক হইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : কিন্তু অবাক কাণ্ড কি জানেন ? পুরুষের এই নবতম কৌশল এক বিশেষ জাতির মেয়ের সামনে পড়লে ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য।

মা : সেটা কী রকম ?

ডাক্তার : সেকেলে মেয়ের কাছে। আপনি যদি রিজিয়াকে এক্কেবারে সেকেলে মেয়ের মতো করে বড় করে তুলতেন তাহলে আমার এই আধুনিকতম শহুরে পন্থায় তার হৃদয় জয় করতে, এক বিকেলের আঠার মিনিটের পরিবর্তে আঠার মাস লাগত। বিশ্বাস করুন, রিজিয়ার আধুনিক উচ্চশিক্ষা, যার শক্তিতে আপনার আস্থা অপরিসীম, সে শিক্ষাই তাকে এত সহজে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছে।

মা : (উঠে দাঁড়িয়ে) তুমি চালাক ছেলে। বেজায় চালাক। আচ্ছা এখন উঠি।

ডাক্তার : (আতঙ্কিত) আমাকে যেতে বলছেন ? রিজিয়ার সঙ্গে একবার দেখা করতেও পারব না ?

মা : না। আমার ধারণা তুমি এ ঘর থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে বোধহয় এখানে আসবেও না। শুধু তোমাকে এড়িয়ে যাবার জন্যই সে একটু আগে এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

ডাক্তার : (একটু ভেবে) শুভ লক্ষণ! আচ্ছা চলি তা হলে।

[বেশ একটা তুষ্টচিত্তে যাবার আয়োজন করে।]

মা : (সতর্ক) এটা শুভ লক্ষণ হলো কী করে ?

ডাক্তার : (দরজা থেকে মুখ ঘুরিয়ে) কারণ, মিলিয়ে দেখলাম যে, দুজনেরই মনের অবস্থা হুবহু এক।

[বের হবার জন্য পা বাড়িয়ে ডাক্তার অবাক হয়ে দেখে, রিজিয়া একেবারে ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে। রিজিয়া একদৃষ্টিতে ডাক্তারকে দেখে। ডাক্তার শুধু অসহায় চোখ মেলে চুপ করে থাকে। একবার মাথা ঘুরিয়ে মাকে দেখে। আবার রিজিয়াকে। সম্পূর্ণ দিশেহারা]

রিজিয়া : (সর্বাঙ্গে আবেগের বিক্ষুব্ধ ঝড়। ঠাণ্ডা কঠিন গলায়) মা, বেনুর কাছে যা শুনলাম সেটা তাহলে সত্যি ?

মা : বেনু আবার কী বলল তোমাকে ?

রিজিয়া : আমার আড়ালে আমাকে নিয়ে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমি আলোচনা করছিলে।

ডাক্তার : (আপন মনে) অ্যাঁ! ভদ্দর লোক!

মা : (ডাক্তারকে) চুপ করে থাকতে পারছ না ? কী বিড়বিড় করছ ?

[ডাক্তার করুণ চোখে এর ওর দিকে একবার তাকিয়ে ধপ করে আরাম কেদারায় বসে পড়ে।]

রিজিয়া : (আরো কঠোর) মা এমন কাজ তুমি কোন অধিকারে করলে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : আমায় ভুল বুঝিস না রেজু। যাতে আমার অধিকার নেই এমন একটা কথাও আমি ওর সামনে উচ্চারণ করিনি।

ডাক্তার : (সাহায্য করার ইচ্ছায়) কিছু না, কিছু না, সে রকম কোনো কথাই হয়নি। (মা ও মেয়ে দু'জনেই এমন করে ওর দিকে তাকায় যে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।) অ্যাঁ ! মানে, অন্যায় করেছি। মাফ করে দিন। আর কিছু বলব না।

রিজিয়া : (মাকে) যা নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা নিয়ে অন্য কারো মাথা ঘামাবার অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না।

[আবেগে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়]

মা : রেজু মা, আমি সত্যি দুঃখিত। যদি না বুঝে তোমার আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে থাকি—

রিজিয়া : (তড়িৎবেগে ঘুরে) আত্মসম্মান ? কার আত্মসম্মান ? কিসের আত্মসম্মান ? কিচ্ছু নেই আমার। যার কোনো আত্মশক্তিই নেই, তার আবার আত্মসম্মান কিসের ? (অন্যদিকে ঘুরে) আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা যার নিজের মধ্যে নেই, সে-মেয়েকে বাইরের কোনো শক্তিই বাঁচাতে পারে না। সে চেষ্টা করার অধিকার কারও নেই। না, এমনকি তার মা'রও নেই। আমি জানি, আমার ওপর তোমার যত আস্থা ছিল, এখন থেকে আমি সব হারালাম, যেমন হারিয়েছি এই মানুষটির শ্রদ্ধা—

[গলার কাঁপুনি লুকোবার জন্য দম নেয়]

ডাক্তার : হায়রে! এই মানুষটা!

মা : চুপ করে থাকতে পারছ না!

রিজিয়া : আমার গ্লানি নিয়ে, আমার একা থাকার যে অধিকার তাও কি তোমরা অস্বীকার করবে ? জেনেছি, আমিও অবলার জাত। প্রথম যে পুরুষ এসে চোখে চোখ রাখল তার প্রভুত্ব মেনে নেবার জন্যই জন্ম নিয়েছিলাম। কপালের লেখা খণ্ডাবে কে ? কিন্তু দোহাই তোমাদের, আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে আর অপমান করো না।

[চোখে রুমাল চেপে মুখ আড়াল করে দাঁড়ায়।]

ডাক্তার : (লাফিয়ে উঠে) না না, এ কিন্তু বড্ড—

মা : খোরশেদ!

ডাক্তার : (মরিয়া) না, আমি কারও কথা শুনব না। আমার যা বলবার আছে, আমি তা বলবই। এক মিনিটের চেয়ে বেশিক্ষণ চুপ করে রয়েছি। আর আমি চুপ করে থাকব না। (এগিয়ে গিয়ে) মিস খানম—

রিজিয়া : (তেতো গলায়) মিস খানম কেন আবার ! শুধু রিজিয়া বলে ডাকায় যে এখন কোনো বিপদ নেই সে তো টের পেয়ে গেছেন।

ডাক্তার : তা হোক, তবু আমি মিস্ খানমই বলব। শেষে হঠাৎ বলে বসবেন যে নাম ধরে ডেকে আপনাকে অপমান করেছি, সে-সুযোগ দিতে চাই না। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাকে আমি অশ্রদ্ধা করি এমন বুক-ভাঙা মিথ্যা অভিযোগ আপনি করতে পারলেন ? আপনার ভেতরের অনেক কিছুকেই হয়তো বেশি শ্রদ্ধা করতাম না। যেমন, আপনার গোড়ার দিকের আত্মসচেতন গর্ববোধকে। কেন সেটাকে শ্রদ্ধা করব ? সে-গর্ব তো শক্তির নয়, সে-ছিল কাপুরুষতার। তার জন্য ভয়ে। আপনার বুদ্ধিকেও তত দাম দিইনি। কারণ, সেটা আপনার চেয়ে আমার অনেক বেশি ছিল। ও জিনিসটা আসলেও একান্তভাবে পুরুষেরই সম্পদ। কিন্তু, কিন্তু আলোড়ন উঠল একেবারে গভীরতম স্তরে। সমগ্র সত্তায় অনুভব করলাম পরম মুহূর্তের আগমন। যখন আপনি আমার মধ্যে জাগিয়ে তুললেন দুর্জয় সাহস, তখন, আহ, তখন, তখন! তখনই স-ব!

রিজিয়া : তখনো আমাকে শ্রদ্ধা করেছেন ?

ডাক্তার : শ্রদ্ধা ? একটুও না। তখন হৃদয়ে শুধু বিমুগ্ধতা, শুধু বিহ্বলতা। (এতটা কাব্যিকতায় বিমুখ রিজিয়া উঠে দাঁড়ায়) সে-মুহূর্ত আমার এক অক্ষয় সম্পদ। শত চেষ্টা করলেও আপনারা কেউ সেটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবেন না। এরপর, এখন যা কিছু হোক না কেন, কোনো পরোয়া করি না। (শান্ত হয়ে কেদারায় বসে এবং এক সময়ে আপন মনে বলে ওঠে) খুব এক প্রস্থ আবোল তাবোল বকে নিলাম। বেশ করেছি। মন যদি চায় বলব না কেন ? (মা-কে) রিজিয়াকে আমি ভালোবাসি। ব্যস, আমার আর কিছু বলবার নেই।

মা : খোরশেদ, তোমার মতো ছেলে সমাজের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। তুমি সাংঘাতিক লোক। রিজিয়া, এদিকে এসো। (রিজিয়া কাছে এলে পর গভীর ঘৃণায়) ওকে জিজ্ঞেস করো, এর আগে ওকে কত মেয়ে এই একই প্রেরণা জুগিয়েছে ? (রিজিয়ার চোখে হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠে, রোষে, বিস্ময়ে, ঈর্ষায়) ওই অনুপ্রাণিত বীরপুরুষকে জিজ্ঞেস করো, কতবার ও এমন ইনিয়ে বিনিয়ে কথার ফাঁদ পেতেছে।

ডাক্তার : অন্যায় ! এ ঘোরতর অন্যায়।

মা : জিজ্ঞেস কর না রিজিয়া ?

রিজিয়া : (ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। বদ্ধমুষ্টি সংযত করে) জবাব দিচ্ছ না কেন ?

ডাক্তার : দ্যাখো, রিজিয়া, দোহাই তোমার, অত রেগে গেলে আমি—

রিজিয়া : যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তার জবাব দাও। এগুলো সত্যি ? আমাকে যেসব কথা বলেছ, এর আগে অন্য মেয়েকেও একই কথা বলেছ ?

ডাক্তার : (বেপরোয়া) বলেছি রিজিয়া, বলেছি।

[রিজিয়ার বদ্ধমুষ্টি শূন্যে উঠে যায় প্রচণ্ড বেগে। মা ছুটে এসে বাধা দিয়ে]

মা : রেজু ! রেজু ! ছিঃ মা! হুঁশ হারিয়ে ফেলেছ নাকি, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : তুমি জান না রিজিয়া, মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার যে শক্তি, বাকি সব ক্ষমতার মতোই, অপব্যয়ের মধ্যে দিয়েই একদিন তার যোগ্য আধারকে আবিষ্কার করে।

মা : আরেকটা শান দেয়া বুলি।

ডাক্তার : হুম্ !

রিজিয়া : মা, মিছেমিছি কষ্ট করছ। আমাকে সাবধান করে দেয়ার জন্য কারও সাহায্য আমি চাই না। (ডাক্তারকে) তুমি আমাকে প্রেম নিবেদন করার চেষ্টা করেছিলে।

ডাক্তার : কোনো সন্দেহ নাই।

রিজিয়া : প্রতিদানে, জেনে রাখো, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, যতদূর সম্ভব ঘৃণা করি।

ডাক্তার : (গম্ভীর) আশ্চর্য কি জানো, এ দুয়ের মধ্যে কোনো সীমারেখা আছে বলে দর্শনশাস্ত্র স্বীকার করে না। (রেগে রিজিয়া ঘরের অন্য প্রান্তে চলে যায়। ডাক্তার মা'র সঙ্গে আলাপ করে) আমি এমন অনেক বিবাহিত স্ত্রীকে দেখেছি যারা তাদের স্বামীকে গভীরভাবে ভালোবাসে কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অবিকল এ রকমই ব্যবহার করে।

মা : কিছু মনে করো না। আমার কিন্তু মনে হয় তোমার এখন বিদায় নেয়াই উচিত।

রিজিয়া : যদি আমার জন্য হয় তবে ডাক্তারের কোনো দরকার নেই। উনি থাকুন বা না থাকুন তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমার দিক থেকে উনি এখন সম্পূর্ণ অর্থহীন। থাকতে ইচ্ছে হয় থাকবেন, কিসু-বেনুর হয়তো ওকে নিয়ে কিছু হৈহল্লা করতে খারাপ নাও লাগতে পারে।

[জানালার কাছে গিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে পড়ে।]

ডাক্তার : (উল্লসিত) এতক্ষণে খাঁটি কথা বলেছেন। সমস্ত ব্যাপারটার জন্য এইটেই হলো এখন আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি। (মাকে) আপনার দিক থেকেও গোটা ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখা উচিত। আমার মতো একটা নগণ্য জীবকে নিয়ে সবাই মিলে উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোনো মানে হয় না।

মা : মানে হয়। তোমাকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না যে তোমার ঐ হাল্কা বুলির চাল নিছক অর্থহীনতা এবং নির্লজ্জতার প্রকাশ।

রিজিয়া : (আপন মনে অথচ জোরে) কত নির্লজ্জ এবং কত অর্থহীন সেটা সবাই বুঝতে পারে!

মা : দেখ খোরশেদ, আমি বেনু-কিসুকে এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি। অবস্থাটা যাতে স্বাভাবিক হয় তার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

ডাক্তার : আপনার ব্যক্তিত্বে আমি অভিভূত। এতখানি মেহমানদারীর জন্য শুক্‌রিয়া।

[ওয়েটার প্রবেশ করে]

ওয়েটার : আসাদুল্লাহ্ সাহেব এসেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : এখানে নিয়ে এসো।

ওয়েটার : তিনি যে বাইরের বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন। আপনার সঙ্গে ওখানে দেখা করতে চান।

মা : চল। খোরশেদ, বেনু-কিসুকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান]

ডাক্তার : (রিজিয়ার কাছে এসে) আমার কথা শোন। আজ না হয় কাল তুমি আমাকে ক্ষমা করবেই। সেটা এখন করতে দোষ কী ?

রিজিয়া : (ঘোষণার গুরুত্ব অনুযায়ী সমুন্নত গ্রীবায় ও কণ্ঠে) অসম্ভব! কোনোদিন না। তৃণে যতদিন প্রাণ আছে, সাগরে যতদিন তরঙ্গ থাকবে। কোনোদিন না। কোনোদিন করব না।

ডাক্তার : (দমে যাবার পাত্র নয়) বেশ, না করলে। বয়েই গেল। আমার তাতে ক্ষতি নেই। আজ থেকে আমার জীবনেও আনন্দের কোনো শেষ থাকবে না। তৃণে যতদিন প্রাণ আছে, সাগরে তরঙ্গ, কোনোদিন এ আনন্দের শেষ হবে না। তোমার সামান্যতম স্মৃতিও আমাকে আনন্দে মাতাল করে তুলবে। (কি একটা বলার জন্য রিজিয়া ঠোঁট খুলতেই) না, ভয় নেই, যা ভেবেছ তা নয়। এ কথাটা আমার কাছেও আনকোরা— তোমার আগে আর কাউকে বলিনি।

রিজিয়া : আজকে নতুন আছে। কাল যখন আবার আরেক মেয়েকে শোনাবে তখন আর নতুন থাকবে না।

ডাক্তার : রিজিয়া, রিজিয়া! দোহাই তোমার। অমন করে কথা বলো না আর!

[বলতে বলতে একেবারে নতজানু হয়ে রিজিয়ার পদপ্রান্তে বসে পড়ে]

রিজিয়া : একি করছ! উঠে দাঁড়াও বলছি। আশ্চর্য সাহস তোমার!

[বেনু ও কিসু ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সামনের দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ায়। ডাক্তার তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়ায়।]

কিসু : (শরিফ আদমি) গোস্তাকি মাফ করবেন, বড় অন্যায় হয়ে গেছে। চলরে বেনু আমরা অন্যদিকে চলে যাই।

রিজিয়া : (বিরক্ত) কিসু, যেও না। মা এক্ষুণি আসছেন। এখানেই অপেক্ষা করো। (সবার দিকে পেছন দিয়ে আবার জানালায় দাঁড়ায়।)

কিসু : তাই নাকি ? তাহলে তো কথাই নেই।

বেনু : নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই !

কিসু : ডক্টরকে দেখে মনে হচ্ছে খুব খোশ -মেজাজে আছেন।

ডাক্তার : ঠিক ধরেছ। (বেনু আর কিসুর মাঝখানে এসে গম্ভীরভাবে দাঁড়ায়) দ্যাখো, তোমাদের দু'জনকে একটা কথা বলব। চারদিকের ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করতে পেরেছ ?

[রিজিয়া ঘুরে দাঁড়িয়েছে নতুন একটা কিছু আক্রমণের অপেক্ষায়]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : অনেকখানি।

ডাক্তার : যতদূর জেনেছ তার পরেরটুকুও শুনে রাখো। সব খতম। আমাদের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেছে। আমাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, চরম ঘৃণার সঙ্গে। আমার উপস্থিতি পর্যন্ত এখন অনেকের কাছে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক। আমার কোনো মিনতিই তোমার বোনকে টলাতে পারেনি। আমার প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করতেও তিনি নারাজ। আমাদের মধ্যে সব খতম হয়ে গেছে। (রিজিয়া অবজ্ঞার সঙ্গে আবার ঘুরে জানালার কাছে চলে যায়) এবার বুঝতে পেরেছ তো সব ?

বেনু : তা বুঝব না কেন ? বেশ হয়েছে। অত তাড়াহুড়া করে এগুলে শেষে এ রকম পস্তাতেই হয়।

কিসু : (সান্ত্বনা দিয়ে) এতে হতাশ হবার কিছুই নেই ডক্টর। বরঞ্চ আমিও মনে করি জোর বেঁচে গেছেন। বিয়ে হলে আপনার মতো লোককে আপা গোটা গিলে ফেলত! নিজের আত্মাটাকেও নিজের বলে চিনতে পারতেন না! তার চেয়ে এই বেশ হয়েছে। অতীতটা মুছে ফেলুন স্মৃতি থেকে। শুরু হোক নব যাত্রা!

বেনু : তা সে নবম দশম একাদশ যত নম্বর যাত্রাই হোক না কেন! সে সংখ্যার কথা তো আমাদের জানা নেই।

ডাক্তার : (খুবই আহত) বেনু, তোমার এই কৌতুকটা এই মুহূর্তে আমার জন্য কত মর্মান্তিক তা তুমি জান না। একটা বেফাঁস হালকা কথা হঠাৎ কী করে জীবনে কত গভীর বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।

বেনু : তাই নাকি ? হবেও বা।

কিসু : হুম্। (খুব একটা মাতব্বরি চালে টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়)

[আসাদুল্লাহ সাহেব। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর চোখ-মুখ। মাকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি প্রবেশ করেন। মা'র উদ্বিগ্ন চোখ প্রথমে খুঁজে বের করে রিজিয়াকে, তারপর এগিয়ে যায়। রিজিয়াও গভীর স্নেহে এগিয়ে আসে মা'র কাছে। আসাদ তার অটল গাম্ভীর্য নিয়ে একটা বড় চেয়ারে বসতে যাবে এমন সময়—]

বেনু : তারপর আসাদ মামা, নতুন কোনো খবর আছে ?

আসাদ : (গাম্ভীর্য অটুট) আমি তোমার বাবার কাছ থেকে আসছি এবং অত্যন্ত গুরুতর খবর নিয়ে এসেছি।

[বেনু সাময়িকভাবে সংযত হতে স্থির করে। সবাই গুছিয়ে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকে।]

ডাক্তার : আমার পক্ষে এখন বোধহয় না থাকাটাই ঠিক হবে ?

আসাদ : মোটেই নয়। ব্যাপারটার সঙ্গে আপনিও গভীরভাবে জড়িত।

[ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে গা ছেড়ে বসে।]

বোন, কোনো রকম ভূমিকা না করেই কথাটা বলে ফেলছি। কিসুর এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনুর এখনো বিশ বছর পূর্ণ হয় নি। মি. ইয়াজদানী সাহেব ওদেরকে কাছে নিয়ে যাবার দাবি জানিয়েছেন।

মা : (তীব্র আশঙ্কায়) বেনুকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে ?

বেনু : (আলোড়িত) কিন্তু মা ওর দিকটাও ভাবো। ভদ্রলোক কী ভালো! আমাদের নিশ্চয়ই খুব ভালোবাসেন। নইলে কাছে নিয়ে রাখতে চাইবেন কেন ?

আসাদ : তোমার সে রকম কোনো ভ্রান্ত ধারণা জন্মে থাকলে সেটা দূর করে ফেল মিস্ বিলকিস।

বেনু : (উল্লসিত আবেগে গুনগুন করে) মিস বিল—কি—ই—স্। ইস্, কী সুরেলা মিষ্টি ডাক। মামা, তুমি ছাড়া আর কেউ অত মধুভরা কণ্ঠে আমায় ডাকেনি। (মামার গলা জড়িয়ে ধরে) মামা, তুমি কত ভালো।

আসাদ : (ঘাবড়ে যায়) আহ্-হা। কী করছ ? কী করছ ? এ কী হচ্ছে ?

মা : বেনু! বিচ্ছেদের শর্ত অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রাখার পুরো অধিকার আমার।

আসাদ : শর্তে এও ছিল যে, সে-অধিকার ততক্ষণই বলবৎ থাকবে যতক্ষণ মি. ইয়াজদানীকে তুমি অন্য কোনো উপায়ে যন্ত্রণা না দিচ্ছ বা তার কাছে না আস।

মা : সে শর্ত কি আমি মেনে চলিনি ?

আসাদ : তোমার সন্তানদের ব্যবহার আইনত মি. ইয়াজদানীর জীবনের শান্তি নষ্ট করেছে কিনা সে বিচার আদালতের ওপর। সে সম্পর্কে তুমি না হয় উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখো। সে যা হোক মি. ইয়াজদানীর বক্তব্য হলো, তার ওপর নতুন করে জুলুম করা হয়েছে। কেবল তাই নয়, তার দৃঢ় ধারণা তোমার ষড়যন্ত্র অনুযায়ী তাকে এখানে আনা হয় এবং সেই চক্রান্তে ডাঃ খোরশেদ তোমার এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন।

ডাক্তার : অ্যাঁ ! কী বলছেন আপনি ?

আসাদ : মি. ইয়াজদানীর অভিযোগ, তাকে বেহুঁশ করে ফেলার জন্য আপনি ওষুধ পর্যন্ত প্রয়োগ করেছিলেন।

ডাক্তার : সে তো করেইছিলাম।

আসাদ : কেন করলেন ?

বেনু : পাঁচ রুপেয়া বেশি রোজগার হবে বলে।

আসাদ : থামো মেয়ে। সব কিছু নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা চলে না। সব ব্যাপারে লঘু-গুরু জ্ঞান হারালে পস্তাতে হয়।

[সবাই এই ধমকে একটু দমে যায়। আসাদও একটু থমকে গলা খাকারি দিয়ে আবার শুরু করে]

মিস্ রিজিয়া খানম! তোমাকে একটা কথা এক্ষুণি জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। যে-কোনো কারণেই হোক তোমার বাবার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, ডক্টর খোরশেদ তোমাকে বিয়ে করতে চায়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : ঠিকই ধরেছেন।

আসাদ : (ডাক্তারকে) তাহলে আপনাকেও একটা নতুন খবর দিয়ে রাখছি। শুনে হয়তো অবাক হবেন যে, মি. ইয়াজদানীর ধারণা, মিস রিজিয়া খানমের আর্থিক প্রতিপত্তির দিকে আপনার নজরটা বেশ তীক্ষ্ণ। তাঁর মতে আপনি একজন অর্থ-লোলুপ পাকা শিকারি।

ডাক্তার : এতে অবাক হবার কিছু নেই। আপনি মনে করেন আমার নিজের রোজগারের ওপর নির্ভর করে আমি বিয়ে করতে সাহস করব ? মাসিক পাঁচ টাকায় বৌ নিয়ে সংসার চলে না।

আসাদ : (স্তম্ভিত) এরপর আমার আর কিছু বলার নেই। আমি চললাম। মি: ইয়াজদানীকে জানিয়ে দেব এ-রকম উদ্ভট পরিবার কোনো পিতার পক্ষেই কাম্য নয়। আমি উঠলাম।

[দরজার দিকে পা বাড়ায়]

মা : আসাদ ভাই ! ডক্টর খোরশেদের না হয় কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। তাই বলে আপনি অমন বেসামাল হলে চলবে কেন ? স্থির হয়ে বসুন। পরামর্শ দিন আমার এখন কী করা দরকার।

[অমায়িকতা ও মর্যাদাবোধ দুয়ের দ্বন্দ্বে বিব্রত আসাদ অবশেষে বসে পড়ে। এবার বেনু এবং মা'র মাঝখানে।]

আসাদ : বেশ ! বেশ ! তাই হবে। আমার বলার খুব বেশি কিছু নেই। বিচ্ছেদের পুরোনো শর্ত তৈরি হয়েছিল মি. ইয়াজদানীকে কলে ফেলে। তাকে পুরপুরি কোণঠাসা করে।

মা : আপনার এ রকম মনে করার পেছনে কোনো যুক্তি আছে ?

আসাদ : আছে, বোন, আছে। সেদিন তুমি ছিলে অগ্নিময়ী, বিদুষী, আধুনিকা। পরোয়া করতে না সমাজের, তোয়াক্কা করো নি দুনিয়ার সমালোচনাকে।

মা : (পুরনো গর্বে অটুট) তারপর ?

[রিজিয়া নিচু হয়ে মাকে আদর করে। হঠাৎ আদরে মা এলোমেলো হয়ে যায়।]

আসাদ : আর অন্যদিকে মি. ইয়াজদানীর কথা একবার ভেবে দেখ। সাধারণ সামাজিক শরিফ লোক। খবরের কাগজে কখন কোন কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে সেই ভয়েই সর্বক্ষণ তটস্থ। একবার নিজের ব্যবসার কথা ভাবেন, আবার ভাবেন তাঁর পুরনো খানদানের কথা।

মা : ওর প্রাচীন চিন্তাধারার জন্যও আমাকে মাশুল দিতে হতো নাকি ?

আসাদ : আমি সে কথা বলছি না। আমি স্বীকার করছি তার অনেক দোষ ছিল। অন্যায়ও সে প্রচুর করেছে।

মা : যাক, কিছু তবু স্বীকার করছেন।

আসাদ : কিন্তু সব অপরাধের জন্য শুধু কি সে একাই দায়ী ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : তবে সব অপরাধ আমার ?

আসাদ : তেমন অভিযোগ কি আমি করেছি ?

রিজিয়া : (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) অন্তত আপনার কথার ঝোঁক সেই দিকেই ছিল।

আসাদ : তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। কোনো ফাঁকই তোমার নজর এড়ায় না। তবু আমি যা বলতে চাইছিলাম সেটা আমি বলছি। বিয়ে করে যখন কেউ আবিষ্কার করে যে দু'জনে মিল হচ্ছে না—দোষ হয়তো কারো নয়, রুচিতে বেমিল হয়ে গেছে, হয়তো তাতে কারও কোনো হাত ছিল না—যখন দেখে সেই দোষে তার দাম্পত্য শান্তি পর্যন্ত উবে গেছে, যে শান্তির জন্যই বিয়ে করা—যখন সে বুঝতে পারে যে বিয়ে করে বৌ ঘরে এনেও বৌকে সে পায় নি—সেটা যে বৌয়ের দোষ তা আমি বলছি না, কিন্তু তবু— তখন, সেই লোকটা যদি না বুঝে কেবলই বৌকে দোষী সাব্যস্ত করতে গিয়ে অশান্তিটাকে আরও জটিল করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত মুক্তির কোনো পথ না খুঁজে পেয়ে সুখের সন্ধানে ভালোমন্দ জায়গায় ঠোকর খায়, বদ-অভ্যাসের কবলে গিয়ে পড়ে তখন তার অপরাধ কি কোনো রকমেই ক্ষমার চোখে দেখা যায় না ? সব জেনেও তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে ?

মা : শাস্তি আমি কাউকেই দিতে চাই নি। আমি শুধু নিজেকে এবং আমার সন্তানদের সে দুষ্ট প্রভাব থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি।

আসাদ : তার বদলে আদায় করে নিয়েছিলে কঠিন শর্ত। হুমকি দিয়েছিলে প্রকাশ্য আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করবে বলে-বেচারা সেই ভয়ে নতজানু হয়ে করুণা ভিক্ষা করেছিল। সেই দুর্বলতাই তোমাকে দান করেছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা। মনে কর সে যদি তোমার ওপর তেমন কোনো ক্ষমতার অধিকারী হতো, এবং সেই জোরে সে যদি আপনার সব সন্তানকে জোর করে তার কাছে নিয়ে রাখত এবং এমন করে মানুষ করত যাতে তারা তাদের মায়ের নাম পর্যন্ত আজ শুনতে চাইত না-তাহলে আজকে তোমার সেটা কেমন লাগত ? কী করতে তুমি ? সেই কথা ভেবেও আজ কি ওর জন্য একটুও মায়া হচ্ছে না তোমার ? একটুখানি দরদ, সামান্যতম সাময়িক অনুভূতি—

মা : ওঁর মধ্যে এগুলোর পরিচয় আমি কোনোদিন পাই নি। যা পেয়েছি সে একটা অনিয়ন্ত্রিত মেজাজ, এবং— আর বাকিগুলোর কথা উচ্চারণ করতে চাই না।

আসাদ : কিছু মনে করো না বোন। তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি, মেয়েরাও কত কঠিন হতে পারে।

ডাক্তার : কী সাংঘাতিক রকম তা আপনি ভাবতেও পারেন না।

রিজিয়া : (প্রচণ্ড ধমক) তুমি চুপ কর। (ডাক্তার শান্ত হয়)

আসাদ : (সমস্ত শক্তি একত্র করে) শেষবারের মতো আমি তোমাকে আরেকবার মিনতি করছি। বিশ্বাস করো বোন, দুনিয়ায় এমন লোক আছে যারা অনুভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে জানে কিন্তু প্রকাশ করতে জানে না। সামান্য আবেগকেও মধুর করে প্রকাশ করা, অর্থহীনকে শুধু ভাষায় অপূর্ব করে তোলা, সভ্যতার এই প্রসাধনী রূপ তার এই সূক্ষ্ম কারুকার্য, বেচারা ইয়াজদানী সাদাসিধে লোক, এর কিছুই জানে না! আমি জানি মি. ইয়াজদানীর মেজাজ যাচ্ছে তাই-শুধু এই জন্যই কেউ তার জন্য এক ফোঁটা দরদ দেখাবে না ? তার আপন ছেলেমেয়েরাও না ?

বেনু : (মুগ্ধ) অপূর্ব! কী চমৎকার বাগ্মিতা !

কিসু : মামা, আপনি বলেন ভালো। বক্তৃতায় সত্যি আপনার দখল আছে।

বেনু : মা, মামাকে এখন যেতে দিও না। আমরা আরো শুনতে চাই। এমন চমৎকার করে বলেন উনি। মামাকে বলো রাতের খাবার এখানে সেরে তারপর বাড়ি যাবেন।

মা : সে তোমার মামার খুশি। আসাদ ভাই, রিজিয়ার বাবা সম্পর্কে নতুন করে আমাকে কিছু শোনাবার দরকার আছে বলে মনে করি না। আপনার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি, আমার সঙ্গে হয়েছিল।

আসাদ : মিস্ রিজিয়া খানম, তোমাকেই বলছি। তোমার বাবার মুখে যা শুনলাম তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে বলব, তোমার মা'র চাইতেও তুমি কঠিন, হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর!

রিজিয়া : (উদ্ধত) মা'র শক্তির কাছে হার মেনে এখন আমার দুর্বলতার কাছে আবেদন করছেন ?

আসাদ : একে দুর্বলতা বল তুমি? তোমার মা'র কঠিন বুদ্ধির কাছে হার মেনে তোমার কোমল হৃদয়ের দুয়ারে হাত পেতেছি রিজিয়া।

রিজিয়া : হৃদয় ? হৃদয়কে বিশ্বাস করার যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি। (ডাক্তারের দিকে এক ঝলক অগ্নিদৃষ্টি হেনে) ক্ষমতা থাকলে সেটা আমি উপড়ে ফেলে দিতাম। আমার মা'র যা জবাব আমারও তাই।

আসাদ : আমার আর কিছু বলার নেই। আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। এর চেয়ে বেশি আর কিছু আমি করতে পারতাম না। (উঠে পড়ে)

মা : আপনি কি আমার কাছ থেকে অন্যরকম জবাব আশা করেছিলেন ? সে যাকগে। কিন্তু এখন আমি কী করব সে সম্পর্কে কিছুই বললেন না।

আসাদ : তোমাদের দুজনেরই কোনো উকিলের পরামর্শ নেয়া উচিত। যে শর্ত অনুযায়ী উভয় তরফ থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ স্বীকৃত হয়েছিল, মি. ইয়াজদানী এখনো সেটা পুরোপুরি মানতে বাধ্য কিনা, সেটা যাচাই করে নিতে হবে এবং আমার মতে, যত তাড়াতাড়ি পরিষ্কার ফয়সালায় আসা যায় ততই লাভ। একটা সহজ রাস্তা অবশ্য এখন আমি বাতলাতে পারি। সম্পূর্ণ বন্ধুভাব নিয়ে মি. ইয়াজদানীকে আর একদিন খেতে ডাক, (মা'র ভ্রু কুঁচকানো দেখে আসাদ বাক্য পাল্টায়) না হয় এমনি নিরুত্তাপ ভাব নিয়ে ওকে এখানে একদিন আসতে বল। আজই বল না কেন ? এই হোটেলেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : দরকার হলো একজন উকিলের। আপনার উৎসাহ দেখে মনে হয় এখন তাকে না হলেও চলবে।

আসাদ : না। আমি তার কথা ভেবেই এই প্রস্তাব করেছি। তোমাদের এখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ দেখা পেলাম আমার এক পরিচিত অ্যাডভোকেটের। মি. ইকরামুল হক। অল্প বয়স। কিন্তু আশ্চর্য মেধা। এর মধ্যে বেশ নামও করেছে। আমার মক্কেলের কেস নিয়েই প্রথম নাম করেছে বলে আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে। গল্প করতে করতে ইয়াজদানীর কথাও ওর সঙ্গে আলোচনা হলো। উভয় পার্টির সাক্ষাতে এ নিয়ে যে-কোনো দিন আলোচনা করতে রাজি আছে। এর চেয়ে কম হৈ-চৈ করে এ কাজ সারা যাবে না। তুমি অনুমতি দিলেই আমি যেমন করে পারি ইয়াজদানীকে পাকড়াও করে আনব। দোহাই তোমার! না করো না।

মা : (মুহূর্তের স্তব্ধতার পর) আসাদ ভাই, আমার জন্য উকিলের পরামর্শ খুব দরকার আছে বলে মনে করি না। কারো উপদেশ নির্দেশ অনুযায়ী চলা আমার রীতি নয়। তাছাড়া ইয়াজদানীর সঙ্গে আবার আমার সাক্ষাৎ হোক, এটাও আমার ইচ্ছে নয়। এবং সে সাক্ষাতে তেমন কিছু ফল হবে না বলে আমার ধারণা। তবু (দাঁড়িয়ে) মনে হচ্ছে আপনার বক্তৃতায় আমার ছেলেমেয়েরা কিছুটা মত পাল্টিয়েছে। এ রকম ক্ষেত্রে আপনি যা বলবেন, তাই হবে।

আসাদ : বড় খুশি হলাম। আজ রাত ন'টায়, খাওয়া-দাওয়ার পর। তোমার আপত্তি নেই তো?

মা : তাই হবে। কিসু, ওয়েটারকে ডেকে ব্যবস্থা ঠিক রাখতে বলে দাও। খোরশেদকেও যখন চক্রান্তের একজন বলে সন্দেহ করা হয়েছে তখন, আমার মতে, তারও উপস্থিত থাকা উচিত। (কলিং বেল টেপে)

ডাক্তার : আপনার সঙ্গে আমিও একমত। আমার উপস্থিত থাকা খুবই দরকার।

আসাদ : আমরা কেউ তাতে আপত্তি তুলিনি। একটা আনন্দপূর্ণ সুরাহার প্রত্যাশায় ছটফট করছি। এখন আসি তাহলে।

[দোরগোড়া পর্যন্ত হাসিমুখে পথ দেখিয়ে দেয় ওয়েটার। আসাদ চলে গেলে পর এগিয়ে আসে।]

মা : রাত্রিবেলায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে কিছু লোক আসছেন। একটু তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া চুকিয়ে ফেলতে চাই।

ওয়েটার : সাতটায়? তাই হবে। ভালোই হয়েছে। আজ রাতে এমনিতেই হোটেলময় যা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, তাতে খাওয়া-দাওয়া আগে শেষ করলেই ভালো হবে।

বেনু : কিসের উৎসব?

ওয়েটার : এখানে হোটেলের রীতি। বছরের পয়লা দিন খুব জাঁকজমক করে আয়োজন করা হয়। অনেক চীনে লণ্ঠন, আতসবাজি, ফুলের তোড়া, বেহালা বাঁশি সানাই কিছুই বাদ যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : হুর্‌রে, আজই তো পয়লা তারিখ।

ওয়েটার : বিশেষ আয়োজনও একটা করা হয়েছে। যার যেমন খুশি পোশাকের প্রতিযোগিতা। এক টাকা করে প্রবেশ-ফি।

কিসু : (ওয়েটারকে পাকড়াও করে) এতক্ষণ বলনি কেন? শিগগির চল। প্রবেশপত্র কোত্থেকে নিতে হবে?

বেনু : (অন্যদিক থেকে পাকড়াও করে) তাড়াতাড়ি করো না। ফুরিয়ে গেলে শেষে মজা বুঝবে।

[ওয়েটারকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়।]

মা : (পেছনে যেতে যেতে) এ দেখছি আরেক ঝঞ্ঝাট। না না, আজকে রাতে এসব নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না। ওদের সামনে থাকা দরকার। না, ওদের নিয়ে আর পারি না বাপু। (প্রস্থান)

[রিজিয়া ভালো করে ডাক্তারকে একবার দেখে নেয়। তারপর অত্যন্ত স্পষ্ট করে হাতঘড়িতে সময় দেখে।]

ডাক্তার : অত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবার দরকার নেই। অনেকক্ষণ আগেই যে চলে যাওয়া উচিত ছিল, তা জানতাম। এবার যাচ্ছি।

রিজিয়া : (নিখুঁত ভদ্রতায়) আপনাকে দু'একটা অনাবশ্যক কড়া কথা বলে ফেলেছি। কোনোটা হয়তো রূঢ় হয়ে থাকবে। আমি সে জন্য ক্ষমা চাইছি।

ডাক্তার : ক্ষমা চাওয়ার কোনো দরকার ছিল না।

রিজিয়া : সবটা দোষ অবশ্য আমার নয়। যাকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয় সে নিজেই যদি তার গুরুত্ব আর মর্যাদাবোধকে খুইয়ে বসে, তখন অন্য তরফের দোষ দেয়া যায় না।

ডাক্তার : নিজের মর্যাদাবোধকে বাঁচিয়ে রাখার মতো কাণ্ডজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন লোকের থাকে না।

রিজিয়া : (মুহূর্তে রেগে গিয়ে) চুপ করুন। আপনাকে বারণ করে দিচ্ছি, দ্বিতীয়বার আপনি আমার সামনে এ রকম অপমানজনক উক্তি উচ্চারণ করবেন না।

ডাক্তার : বেশ! আমিও জানি এসব কথা অর্থহীন প্রলাপ! কিন্তু কী করব, বাক্য রোধ করতে পারি না।

রিজিয়া : যদি সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসতে তাহলে এ রকম চপলতা তোমার মধ্যে থাকতে পারত না। প্রেমই তোমাকে দান করত শক্তি, মর্যাদা, এমনকি মাধুর্য।

ডাক্তার : প্রেম আমার মতো লোককেও মধুর করে তুলতে পারে, সত্যি তুমি তা বিশ্বাস করো? (রিজিয়া অবজ্ঞায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়) তার মানে ওটা তুমি অন্তর থেকে বলনি। আসলে কি জান, নতুন কিছু দান করার মতো অলৌকিক শক্তি প্রেমেরও নেই। গুণ নিয়ে জন্মালে হয়তো প্রেম তাকে জাগিয়ে তুলতে পারত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিজিয়া : (সবেগে ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়ায়) শুনতে বড় সাধ হয়, আপনি নিজে কোন গুণ নিয়ে জন্মেছেন ?

ডাক্তার : আনন্দময় এক লঘুচিত্ত।

রিজিয়া : থামলেন কেন ? বাকিটুকুও বলে ফেলুন। লঘু বুদ্ধি, লঘু বিশ্বাস! যা যা নিয়ে মানুষ গৌরবময় তার সব কিছুই আপনার মধ্যে লঘু।

ডাক্তার : একটুও মিথ্যে বল নি। সারা দুনিয়াটাই আমার কি মনে হয় জান ? হালকা এক বকের পালকের মতো, আলোতে ঝলমল করে বাতাসে নাচছে! আমার রিজিয়া হলো সূর্য। (রিজিয়া ভয়ঙ্করভাবে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়।) কী হলো ? এখনো কি আবোল-তাবোল বকছি ? মাফ কর। আমি এবার পালালাম। বেশিক্ষণের জন্য নয়। ঠিক নটায় নিশ্চয়ই আবার হাজির হব। চলি।

[রিজিয়া নির্বাক হয়ে তাকিয়েই আছে আর ডাক্তার সম্পূর্ণ হৃষ্টচিত্তে লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে যায়।]

রিজিয়া : (এমন করে হঠাৎ তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সক্রোধে এবং সুউচ্চ কণ্ঠে) হাঁদারাম! একটু যদি বুদ্ধি থাকত!

পর্দা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অঙ্ক

[রাত নটা। খোলা জানালা দিয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের রেশ ভেসে আসছে। এখানে ওখানে নানা রঙের চীনা লণ্ঠন জ্বলছে। ওয়েটার আসাদ ও ইয়াজদানীকে নিয়ে প্রবেশ করে। ইয়াজদানীর চেহারা বড়ই করুণ। উদ্বিগ্ন ও ভয়ার্ত। ক্লান্ত। চেয়ারে বসে পড়ে।]

ওয়েটার : সবাই নিচে হল ঘরে রয়েছেন। আপনারা বসুন। আমি এক্ষুণি খবর দিচ্ছি। (যাবার জন্য পা বাড়ায়।)

আসাদ : আর শোন। আমাদের আরো একজন লোক এখনো এসে পৌঁছোয় নি। কেউ এসে খোঁজ করলেই সোজা আমাদের এখানে নিয়ে আসবে।

ওয়েটার : জি। (চলে যাবে।)

আসাদ : (ইয়াজদানীকে) আশা করি আপনার ওপর এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি।

ইয়াজ : কথা যখন দিয়েছি, রাখব। টু শব্দটিও করব না। সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলেও দাঁত কামড়ে ধৈর্য ধরে থাকব। তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই।

আসাদ : বেশ! বেশ! ওদের সামনে যেন আপনাকে খাটো হতে না হয় সে দায়িত্ব আমার। সারা বিকেল ওদেরকে বুঝিয়েছি যে, সব দোষ ওদের।

ইয়াজ : আমাকে তো বলেছ সব দোষই নাকি আমার।

আসাদ : যা বলেছি, ঠিকই বলেছি।

ইয়াজ : (মৃদু আর্তনাদ) ছেলেমেয়েগুলো যদি শুধু মানুষের মতো সামান্য দরদও আমার জন্য দেখাত—

আসাদ : ও রকম আশা মন থেকে মুছে ফেলুন। ওরা কেউ আপনার জন্য কোনো রকম দরদ প্রকাশ করবে না। ওদের সে বয়স হয় নি। এখনো যদি এসব অবাস্তব আশা আঁকড়ে ধরে থাকতে চান তাহলে এখানে আসাই অন্যায় হয়েছে। বাড়ি ফিরে চলুন।

ইয়াজ : কিন্তু এইটুকু দাবি করার অধিকারও কি আমার—

আসাদ : না নেই। থাকলেও আপনার সে অধিকারকে কেউ এখানে স্বীকার করছে না। সেগুলো ভুলে যান। শেষবারের মতো আমাকে কথা দিন যে যাই ঘটুক না কেন— কোনোরকম অভিযোগ ছাড়া, কোনোরকম উত্তেজনা ছাড়া- আপনি সেটাকে মেনে নিতে চেষ্টা করবেন। এ রকম মনোভাব যদি এখনো আয়ত্ত করতে সক্ষম না হয়ে থাকেন— তাহলে আমি আবার প্রস্তাব করছি, বাড়ি ফিরে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : থাক্, থাক্! যথেষ্ট হয়েছে! আর বলতে হবে না কিছু। (করুণ) সবাই মিলে আমাকে ধমকাচ্ছ, সবাই মিলে আমার ওপর জুলুম করছ! বেশ, যা খুশি করো। কিছু বলব না। যতদূর পারি মুখ বুজে সহ্য করব। কিন্তু, কিন্তু আসাদ, ঐ মেয়েটা, ঐ বড় মেয়েটা, আজও যদি এসে আবার গতকালের মতো কথাবার্তা শুরু করে, আর ঐ রকম করে আমার দিকে তাকায়, তাহলে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি— তোমার এসব কিছু আমি,—না না, আমি কিছু জানি না।

[দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে কপাল চেপে ধরে।]

আসাদ : আহাহা! কী ছেলেমানুষি করছেন। আগে থেকেই মন্দটা অত ভাবছেন কেন ? অন্যকে সহ্য করুন, নিজে সহ্য করতে শিখুন। দেখবেন, দুনিয়া আপনার পক্ষ নিতে বাধ্য। ঠিক হয়ে নিন, বারান্দায় কে যেন এসেছে মনে হলো। ও এলো বোধহয়।

[উঠে দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই প্রবেশ করে রিজিয়া। বেরিয়ে যাবার সময় চোখে মুখে কাতর মিনতিসহ রিজিয়ার কানে কানে।]

মিছেমিছি ওকে কষ্ট দিও না। আমার অনুরোধ। তোমাদের মধ্যে আমি আর থাকতে চাই না এখন।

[দ্রুত পায়ে চলে যায়। রিজিয়া খুব শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসে]

ইয়াজ : (আতঙ্কে) আসাদ কোথায় গেল ?

রিজিয়া : (হালকা সুরে তবে নরম গলায়) বেরিয়ে গেলেন। তৃতীয় কেউ থাকলে আমরা অস্বস্তি অনুভব করি নাকি, সেজন্যই হয়তো চলে গেছেন। ওর সৌজন্যবোধটা বেজায় সূক্ষ্ম! (আরও কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে) কিছু বলছেন না কেন বাবা ?

ইয়াজ : আমায় বলছ, মা ?

[অদ্ভুতভাবে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়ে হাত বাড়িয়ে বাবার হাত ধরে। ইয়াজদানী স্পষ্ট নড়ে যায়।]

(মেয়ের হাত ধরে) তোমার মা'র বিরুদ্ধে কটু কথা বলেছি বলে তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না ?

রিজিয়া : কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন ? হুম্! তখন আমিও কথা বলছিলাম কত উঁচু থেকে আর কত ভারিক্কি চালে! এখন আর আমি অত উঁচুতে নেই। এরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছে।

ইয়াজ : সে-কী ?

রিজিয়া : থাকগে সে সব কথা। তখন ছিলাম মায়ের মেয়ে, চালচলনে, হুবহু মায়ের ঠাট্। এখন তার কিছু বাকি নেই, সব খুইয়ে বসেছি। এখন আমি-শুধুই আমার বাবার মেয়ে। এটা কি একটা বড় রকমের অধঃপতন নয় ?

[ধপ্ করে কার্পেটের ওপর বসে পড়ে। হতাশার প্রতিমূর্তি]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : (দপ্ করে জ্বলে ওঠে) অধঃপতন ? (রিজিয়া নির্লিপ্ত। বাবা প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে) না, না! আমি ক্ষুব্ধ হব কেন ? হয়তো তোমার কথাই ঠিক মা। ঠিকই বলেছ! তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। মাঝে মাঝে আমার কী যেন হয়ে যায়! আমি যে বুঝি না তা নয়। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কোনটা যুক্তিসঙ্গত, বুঝি সব ঠিকই। কিন্তু করবার বেলায় ঠিক উল্টোটা করে বসি। তোমার বোধহয় বিশ্বাস হচ্ছে না।

রিজিয়া : বিশ্বাস হবে না কেন ? এ যে হুবহু আমি, অবিকল আমারই কাণ্ড! ভালো করে জানি কোন কাজটা বড়, মহৎ, মর্যাদাবান, ন্যায়সঙ্গত। যতটা মা জানেন আমিও ততটা জানি। কিন্তু কাজের বেলায় কী সব যা তা করে বসি। এমন সব কাণ্ড, মনে হলেও লজ্জায় মরে যাই। নিজে তো করিই, অন্যকেও করতে দি।

ইয়াজ : তোমার মা বুঝি সব কথাই জানেন ? তোমার ধারণা তাঁর কোনো ভুলই হয় না।

রিজিয়া : (বাবার হাঁটুর ওপর দু'হাতে দু'হাত আঁকড়ে) না। বাবা রাগ করো না। একটা কথা এখনই আমাদের মধ্যে হয়ে যাওয়া দরকার। মা'র বিরুদ্ধে কিছু করা চলবে না। এমনকি, মা'র বিরুদ্ধে কোনো চিন্তাকেও আমরা প্রশ্রয় দেব না। মা আমাদের চেয়ে অনেক ওপরে, আকাশের সমান উঁচুতে। এইটে আগে মেনে নাও, তারপর অন্য কথা।

ইয়াজ : বেশ। তুমি যা বলবে, আজ সব মেনে নেব।

রিজিয়া : (জবাবে সন্তুষ্ট হয় না। বাবার মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) মাকে তুমি একটুও পছন্দ কর না, না ?

ইয়াজ : তোমার সঙ্গে নয়, তোমার মা'র বিয়ে হয়েছিল আমার সঙ্গে। তোমার চেয়ে ওঁকে আমি অনেক বেশি জানি। (রিজিয়া দাঁড়িয়ে পড়ে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে) আমি এখনো বলব, আমার জন্য সত্যিকারের কোনো দরদ না নিয়ে আমাকে বিয়ে করে সে আমার প্রতি ঘোরতর অন্যায় করেছিল। তারপর অবশ্য, সে অন্যায়ের পাল্টা আমিও হাজার রকমের অন্যায় অপরাধ করেছি।

রিজিয়া : (কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটু হেসে বাবার হাত আবার তুলে নেয়)। বেশ, আবার রফা হয়ে গেল। কিন্তু তবু সাবধান। মা'র ব্যাপারে আমি যে-কোনো মুহূর্তে সংঘাতিক হয়ে উঠতে পারি। আমার যা কিছু দরদ, আমার ভীরু দুর্বল নারীচিত্তের যা কিছু আবেগ, সব তোমার। কিন্তু আমার বুদ্ধি, আমার বিবেক, আমার বিবেচনা সব মায়ের পক্ষে থাকবে।

ইয়াজ : আমি এতেই খুশি। তোমার ভাগ-বাটোয়ারা মেনে নিচ্ছি।

[ডাক্তার ঢুকল। রিজিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুখে চোখে হিমগর্বিত ভাব ফুটিয়ে তোলে।]

ডাক্তার : মাফ করবেন। ফ্যান্সি ড্রেসে এমন ভিড় জমেছে যে আজ সৈয়দকে পর্যন্ত খুঁজে পেলাম না। বাধ্য হয়ে কোনো খবর না দিয়েই ঢুকে পড়তে হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে ভেবেছিলাম প্রতিযোগিতায় অংশ নেব। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম প্রবেশপত্র যোগাড় করার মতো টাকা নেই। অগত্যা কী আর করা ? তা এখন কেমন আছেন মি. ইয়াজদানী ? দাঁতের খবর কী ?

ইয়াজ : তোমার ছাইভস্ম ওষুধে কিছু হয়নি। দাঁত আমার এমনিতেই ভালো হয়ে গেছে।

ডাক্তার : শুনলেন তো মিস্ খানম! অকৃতজ্ঞতা একেই বলে। মরণ-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করেও নিন্দা শুনতে হচ্ছে।

রিজিয়া : (কঠিন) ন'টা বোধহয় বাজেনি। বাজলে মা নিশ্চয়ই এখানে হাজির থাকতেন। তাছাড়া আসাদ মামা যে ভদ্রলোককে আসতে বলেছিলেন তিনিও এখনো এসে পৌঁছোননি।

ডাক্তার : তিনি এসে পড়েছেন অনেকক্ষণ আগেই। আমার সঙ্গে দেখাও হয়েছে এবং কথাও বলেছি। (হাসিমাখা ব্যঙ্গে) মানুষটার মধ্যে আবেগ বলে কিছু নেই, সব একেবারে মগজ, বুদ্ধির পাহাড়। মিস্ খানমের নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। লোকটার মধ্যে বুদ্ধির চাকা সবসময় ঘর্ ঘর্ করছে, কাছে এসে দাঁড়ালে শুনতে পাওয়া যায়।

রিজিয়া : (ভ্রূক্ষেপ না করে) কোথায় উনি ?

ডাক্তার : হাতির শুঁড়ের মুখোশ কিনে প্রতিযোগিতায় ঢুকে পড়েছেন।

ইয়াজ : (ঘড়ি দেখে বিরক্ত। কড়া।) সময় হয়ে গেছে, অথচ সবাই দেখছি ফুর্তি নিয়ে মশগুল। আমার কাছে এসব পাগলামি বিরক্তিকর। আর কতক্ষণ এমনি বসে থাকতে হবে ?

ডাক্তার : না না। এক্ষুণি এসে পড়বে সবাই। এগুলো তো আধঘন্টা আগের কথা। পয়সা ছিল না বলে আমি ঢুকতে পারলাম না। অগত্যা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে, লুকিয়ে লুকিয়ে মিস্ রিজিয়া খানমকে দেখছিলাম। হঠাৎ উনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন দেখে আমিও ওপরে উঠে এলাম।

রিজিয়া : প্রকাশ্য ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে কোনো ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করে বেড়াতে লজ্জা করল না আপনার ? এত নিচে নেমে গেছেন আপনি ?

ডাক্তার : ইচ্ছে করে কি আর নেমেছি ? কেউ আমাকে নামিয়ে নিয়ে গেছে। বাঁচাতে হলে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।

[রিজিয়া মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে সরে যায়। ডাক্তার না ঘাবড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে কুর্সি টেনে বসে। ওয়েটার মিসেস রোকেয়া আহসান এবং আসাদুল্লাহকে নিয়ে প্রবেশ করে।]

মা : আপনাদেরকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত।

[পেছনের জানালায় একটা বিকট হাতির শুঁড়ওয়ালা মুখ ভেসে ওঠে]

সৈয়দ (হাতির শুঁড়কে) মাফ করবেন। আপনি বোধহয় ভুল করেছেন। এটা সে ঘর নয়। এটা প্রাইভেট কামরা। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমি নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছি আপনাকে। ঐ দিকে চলুন।

[ইশারা করে ওয়েটার পথ দেখিয়ে দেবার জন্য বেরিয়ে যায়। অন্য দরজা দিয়ে শুঁড় দোলাতে দোলাতে প্রবেশ করে মুখোশপরা মানুষটি। সহজভাবে এগিয়ে আসে টেবিলের কাছে। তারপর অত্যন্ত সাবলীল গাম্ভীর্যের সঙ্গে শুড়টা খুলে ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রাখে। অপূর্ব শক্তিমান বলিষ্ঠ পুরুষ। পোশাক, চুল, জুতো, সব মাজা-ঘষা, ঝকঝকে। বাইরে থেকে হঠাৎ মনে হয় লোকটা অতিমাত্রায় শারীরিক। কিন্তু একটু পরে বোঝা যায় বুদ্ধিতেও লোকটা সমান ভয়ঙ্কর। চাল-চলনে এমন একটা প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে যা চারধারে সহজেই সৃষ্টি করে প্রবল আলোড়ন, লোককে করে তোলে সন্ত্রস্ত। তার ব্যক্তিত্বের এই ভয়ঙ্করতা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সে কথা বলতে শুরু করে। গাঢ় শানানো গলা। প্রতিটি বাক্য উচ্চারণের নিপুণ কৌশল, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মর্মভেদী চাহনি। সব মিলিয়ে মনে হয় এ লোক কথা বলতে শুরু করলে পাথরও তন্ময় হয়ে শুনতে বাধ্য হবে।]

লোক : আমার নামই একরামুল হক। (সবাই হক্‌চকিয়ে যায়) আপনি বোধহয় মিসেস্ রোকেয়া আহ্‌সান, আদাব আরজ। আপনার নাম মিস্ রিজিয়া খানম ? আপনিই মি. আহ্‌সান ?

ইয়াজ : (মেজাজ দেখাতে যতদূর সাহস বাকি রয়েছে তা দিয়ে) আমি মি. আহ্‌সান নই। আমার নাম ইয়াজদানী।

হক : ওহ্! তাই নাকি ? (ডাক্তারকে) আপনি বুঝি মি. কিস্‌মত ?

ডাক্তার : (কিছুতেই প্রভাবান্বিত হবে না) কেন দেখে সে রকম মনে হয় নাকি ? আমার নাম খোরশেদ হোসেন। বেহুঁশ করার ওষুধ আমি প্রয়োগ করেছিলাম।

হক : ওহ্! হ্যাঁ। তাহলে মি. আহ্‌সান কে ? উনি কি এখনো আসেন নি ?

সৈয়দ : (ঢুকতে ঢুকতে) বাইরে গিয়ে আর ওকে খুঁজেই পেলাম না। কোন্ দিক দিয়ে যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন— (মি. হকের দিকে নজর পড়তেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। মুখ দিয়ে আর কথা বার হয় না। যেন ভূত দেখছে।) মাফ্ করবেন, আমি ঠিক, একটু আগে যাকে মুখোশ পরা দেখলাম, সে লোক—

হক : (শান্ত) সে লোক আমি।

সৈয়দ : (অভিভূত) তুমি ? তুমি। ছিঃ ছিঃ। শেষে হাতির শুঁড় পরে এসব! ছিঃ ছিঃ! (হঠাৎ সব গুলিয়ে যায়। পড়ে না যায় এজন্য চেয়ারের হাতল ধরে।) মাফ করবেন আপনারা। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে কী রকম যেন—

হক : বাকিটুকু আমি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি। আমার আরেকটা পরিচয়। আমি ওঁর ছেলে।

সৈয়দ : (হাঁ হাঁ করে) তওবা, তওবা! তোমার আজ হলো কী! ঘরে ঢুকলে হাতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুঁড় লাগিয়ে। তার ওপর এখন সবাইকে বলছ এক খিদমতগার তোমার পিতা। এরপর আর মক্কেল পাবে মনে করেছ ?

মা : আপনার পরিচয় জেনে আমরা খুব খুশি হলাম মি. হক। এদেশে এসে প্রথম যাকে আমরা সবচেয়ে বড় বন্ধু হিসাবে লাভ করেছি সে আপনারই বাবা।

সৈয়দ : বেগম সাহেবা বড় বাড়িয়ে বলছেন। এমন করে বাড়িয়ে বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনার পক্ষে এটা মহত্ত্ব, শরাফত। কিন্তু আমার জন্য একটু অসুবিধাজনক, অস্বস্তিকর। এ ভদ্রলোকের আমি পিতা, এটা মেহেরবানি করে বারবার আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। নিজের জায়গায় নিজে দাঁড়াতে না পারাটাই আমার জন্য মুসিবত। কে কোথায় জন্ম নেয় সেটা নসিবের খেলা। এই সামান্য কারণে এর-ওর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ওলটপালট হয়ে যাবে ? আপনারা আপনাদের কাজ করুন। আমার জন্য খামকা সময় নষ্ট করলেন।

[দু'একটা চেয়ারে ভর করে কোনো রকমে শরীর সোজা রেখে ওয়েটার ঘর ছেড়ে চলে যাবার উপক্রম করছে।]

হক : (বাধা দিয়ে) একটু দাঁড়াও। আমার ধারণা আজকে বিকেলে যা যা ঘটেছে সবই আমার বাবা জানেন। তাই নয় মিসেস্ আহ্সান ?

মা : অনেক সময় একেবারে সামনে হাজির ছিলেন।

হক : সেক্ষেত্রে ওঁর জবানবন্দি আমাদের জন্য বেশি দরকারি।

মা : তাহলে ওঁকেও থাকতে বলি ?

সৈয়দ : দেখুন, আমার ওপর এ অন্যায় জুলুম। আজ অনেক কাজ আমার। বসে থাকলে আমার চলবে না। অনেক কাজ—

হক : তোমাকে না হলে আমাদের চলবে না। তোমাকে থাকতেই হবে বাবা।

রিজিয়া : সবাই মিলে আমরা ওর ওপর বেশি অত্যাচার করছি। ও চাইছে আমাদের তদারক করে বেড়াতে। তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবার আমাদের কোনো অধিকার নেই। সৈয়দ, আমার জন্য এক পেয়ালা কফি, কড়া।

সৈয়দ : (মুহূর্তে প্রাণ পায়) কফি ? কড়া করে ? জরুর। এক্ষুণি আনছি। বড় মেহেরবানি আপনার। আর কারো জন্য কিছু ?

মা : মানে— ইয়ে— আমাকেও এক পেয়ালা কফি দিও! হালকা।

সৈয়দ : হালকা ? জরুর। আর তোমার জন্য ? কফির চেয়ে চা-ই বেশি পছন্দ করবে তুমি।

হক : চা, কড়া।

ডাক্তার : আমার জন্য কফি, কড়া।

সৈয়দ : কফি কড়া, কফি হালকা, চা কড়া, এক্ষুণি আনছি।

[পরমানন্দে প্রস্থান]

আসাদ : আমরা তাহলে এখন শুরু করতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হক : আরেকটু অপেক্ষা করলে হতো না ? মিসেস্ আহসানের স্বামী এসে পৌছোবার আগেই শুরু করা ঠিক হবে কি ?

ইয়াজ : কী যা তা বলছেন। ওর স্বামী তো আমি।

হক : (উক্তির এই বিরোধিতাকে পাকড়াও করে) তা কী করে হয় ? একটু আগেই বললেন আপনার নাম ইয়াজদানী।

ইয়াজ : আমার যা নাম তা আমি বলব না ?

মা : আমি ব্যাপারটা—

রিজিয়া : আমার কথাটা—

আসাদ : মিসেস আহসান হলো—

ডাক্তার : আপনি জানেন না যে—

হক : (প্রচণ্ড গর্জনে) চুপ করুন। (স্তব্ধতা) দয়া করে আপনারা স্থির হয়ে বসুন।

[সবাই হুকুম মোতাবেক বসে পড়ে। মাঝখানে রাজকীয় উজ্জ্বলতায় হক। ইয়াজদানীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে]

এ পরিবারে দেখা যাচ্ছে স্বামীর নাম মি. ইয়াজদানী অথচ স্ত্রীর নাম মিসেস আহসান। গোড়াতেই এতবড় একটা জট রয়েছে যখন তখন এটাকে সাফ করেই কাজ করা হোক।

ডাক্তার : এটাকে আপনি অনর্থক এতবড় করে দেখছেন। সবটা শুনলে আপনিও—

হক : (নির্মম স্পষ্টতার সঙ্গে ডাক্তারকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে) শোনার আমার দরকার নেই। অন্তত আপনার মুখ থেকে। মি. ইয়াজদানীর স্ত্রী হয়তো পরে নতুন নাম গ্রহণ করে থাকবেন, এই তো ? আপনার সাহায্য ছাড়াও এটুকু আন্দাজ করার মতো বুদ্ধি আমার আছে। থাকগে। সে বিশ্বাস আপনার থাকা উচিত ছিল। (ডাক্তার কী একটা বলতে চায়) আমার কথার জবাব দেয়ার দরকার নেই। বরঞ্চ আমাকে সাহায্য করার ইচ্ছা যখন উদ্রেক হবে তখন আমার কথাগুলো একটু নেড়ে-চেড়ে দেখবেন।

ডাক্তার : কোনো মানে হয় না। মশা মারতে কামান দাগলেন। কোনো মানে হয় না। যাকগে, সামান্য ব্যাপার নিয়ে—

হক : না ব্যাপারটা মোটেই সামান্য নয়। কারণ আমরা সবাই চাই—এই পারিবারিক বিরোধের অবসান ঘটুক। এবং সেই পথকে সুপ্রশস্ত করে তোলার জন্য মিসেস আহসানকে একটা কাজ করতে হবে। নিছক সামাজিক সুবিধা ও শালীনতার জন্য তাঁকে তাঁর স্বামীর নাম গ্রহণ করতে হবে।

[বেগম রোকেয়া আহসানের চেহারা কঠিন হয়ে আসে।]

অথবা মি. ইয়াজদানীর নাম পাল্টাতে হবে।

[মি. ইয়াজদানীর চোখে মুখেও বিরুদ্ধ সংকল্পে দৃঢ়তা।]

ব্যাপারটা যে সামান্য নয় ডক্টর খোরশেদ বোধহয় এবার তা বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছেন।

[তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই একবার করে দেখে নিয়ে কুর্সিতে গা এলিয়ে দেয়। ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে শুরু করে।]

আসাদ : (খুব ভয়ে ভয়ে) দেখুন মি. হক, আরো গুরুতর ব্যাপারগুলোর মীমাংসা আগে করে নিলে কি ভালো হতো না ?

হক : না। কারণ, বড় ব্যাপারের মীমাংসা অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে। অন্তত সাধারণত তা হয়ে যায়। গোলমাল বাঁধে খুঁটিনাটি নিয়ে। ছোটখাট ত্রুটির জন্য তীরে এসেও তরী ডুবে যায়। (আসাদ হা করে থাকে) কী ব্যাপার, একমত হতে পারছেন না ?

আসাদ : মানে, আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে ঠিক—

হক : ঠিক বলেছেন। আমার চিন্তাধারা আর আপনার খেয়ালাত যদি হুবহু একই রকম হতো তাহলে আপনি আপনি না হয়ে আমি হয়ে যেতেন। (আচমকা ইয়াজদানীর দিকে ঘুরে) আপনার কথাই আগে শোনা যাক। গোটা সমস্যার মধ্যে কোন অংশটা আপনাকে সবচেয়ে বেশি বিঁধেছে তা গুছিয়ে বলুন।

ইয়াজ : আমার নিছক ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে সবার ওপরে স্থান দিতে চাই না।

হক : আমরা কেউ তা চাই না। (মিসেস আহসানকে) আপনার দৃষ্টিভঙ্গিও নিশ্চয়ই তাই ?

মা : হ্যাঁ। এখানে ব্যক্তিগত অনুভূতির মূল্য যাচাই করতে আমি আসি নি।

হক : (রিজিয়াকে) আপনি ?

রিজিয়া : আমিও তাই।

হক : বেশ।

ডাক্তার : কিন্তু আমি স্বার্থপর। নিছক ব্যক্তিগত অনুভূতির তাগিদ এবং স্বার্থ না থাকলে আমি আসতাম না।

হক : আপনার এই ঘোষণাটিও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ, আপনার ধারণা যে অনুভূতিহীনতার ভান করার চেয়ে আন্তরিকতার ভান করলে মিস্ রিজিয়া খানমের মনের ওপর সেটা বেশি কাজ করবে।

[ডাক্তার হাতে-নাতে ধরা পড়ে মুষড়ে যায়। বাকহীন হাসিটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। হক সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে সম্পূর্ণ খতম করার সাফল্যে গভীর তৃপ্তি লাভ করে। কুর্সিতে আবার গা ছেড়ে দিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে সকল অভিযোগ শোনার জন্য তৈরি হয়ে নেয়।]

এবার তাহলে মি. ইয়াজদানী শুরু করুন। প্রায় সবাই একটা ব্যাপারে অন্তত একমত। আমরা কেউ আত্মস্বার্থ বা আবেগকে কোনোরকম প্রাধান্য দেব না। উত্তম। শুভ-সংকল্প। মানুষ এ রকম সদিচ্ছা নিয়েই সাধারণত শুরু করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : সদিচ্ছার কথা এটা নয়। আমি সত্যি সত্যি এটা বিশ্বাস করি।

হক : আরো উত্তম। আপনার বক্তব্যে আসুন।

ইয়াজ : আমি যে স্বার্থপর নই যে-কেউ তা বিশ্বাস করবে। কথাটা আমার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে।

হক : বেশ। কী হয়েছে আপনার ছেলেমেয়েদের ?

ইয়াজ : (আবেগে) কী হয়েছে ? বলুন কী হয় নি ? আমি ওদের—

হক : থামুন। মি. ইয়াজদানী, আপনি আবার ব্যক্তিগত আবেগকে এর মধ্যে টেনে আনছেন। সেগুলো সরিয়ে রাখুন। আপনার সে সব গভীর অনুভূতির জন্য আমার পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু সেগুলো নিয়ে আমার আসল কারবার নয়। আপনি কী চান, পরিষ্কার করে বলুন। তার বেশি কিছু জানার আমার দরকার নেই।

ইয়াজ : (বিব্রত) মানে, সে কথা, অত স্পষ্ট করে বলা সহজ নয়।

হক : চেষ্টা করুন, আমি সাহায্য করছি। আপনার সন্তানদের কোন দিকটা সম্পর্কে আপনার আপত্তি ?

ইয়াজ : সব কিছু সম্পর্কে। যে পদ্ধতিতে, যে শিক্ষায় ওদেরকে বড় করে তোলা হয়েছে আমার সেটা ঘোরতর রকম অপছন্দ।

[মিসেস আহসান নড়েচড়ে আরো কঠিন মুখ করে বসেন। ভ্রূ কুঁচকে প্রখর হয়ে ওঠেন।]

হক : কিন্তু সেটা এতদিন পরে আপনি বদলাবেন কী করে ?

ইয়াজ : সবটা না পারলেও কিছু কিছু সংশোধন সম্ভব। অন্তত সাজগোজটাকে আরো একটু সভ্য করে তোলা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

ডাক্তার : হুম্! কোনো দরকার নেই তার!

হক : আপনি কেন মাঝখান থেকে কথা বলছেন ?

ডাক্তার : কেন বলব না ? মিস্ রিজিয়া খানমের সাজগোজের সমালোচনা করার উনি কে ?

ইয়াজ : (ক্ষেপে) ওর বাপ।

রিজিয়া : (অনুনয়) বা-বা!

ইয়াজ : (কুঁকড়ে গিয়ে) একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম, মা। তোমার কথা কিছু বলতে চাইনি। আমি ঐ বাকি দু'টোর কথা বলছিলাম। মি. হক, আপনি ওদের এখনো স্বচক্ষে দেখেননি। দেখলে আপনিও স্বীকার করতেন, ওদের সাজগোজের মধ্যে এমন সব ঠাট রয়েছে যেটা চোখে ধাক্কা মারে। যেমন উগ্র তেমনি খেলো।

মা : (আর ধৈর্য রাখতে পারে না) তুমি কি মনে করো ওদের সাজপোশাক এখনো আমি ঠিক করে দিই ? ছেলেমানুষীর একটা সীমা থাকা দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : (ক্ষেপে গেছে। লাফিয়ে) কী বললে তুমি ? আমি ছেলেমানুষ ?

[মিসেসও দাঁড়িয়ে পড়েছেন]

রিজিয়া : এই আপনার প্রতিজ্ঞা ?

ডাক্তার : হাস্যকর! ওদের পোশাক সাজগোজ সবই চমৎকার!

আসাদ : বাই এ রকম যুক্তিহীন হলে কোনো মীমাংসাতেই পৌঁছানো যাবে না।

[হঠাৎ চামচের টুং টাং শব্দ শুনে সবাই তাকিয়ে দেখে ওয়েটার ঘরে ঢুকছে। স্তব্ধতা। ওয়েটার যার যার পেয়ালা এগিয়ে দেয়।]

সৈয়দ : (মি: ইয়াজদানীকে) আপনার জন্যও এক পেয়ালা এনেছি। চিনি কম। একটু আদার ছিটা। আপনার কফি, কড়া। কফি। আপনার কফি, বেগম সাহেবা। বেশি হালকা হয়ে গেছে কি ?

[সবাই শান্ত হয়ে বসে]

মা : আপনার কথার মাঝখানে বাধা দেয়ার জন্য আমি দুঃখিত, মি. হক।

হক : না দিলে ভালো করতেন। (প্রস্থানোদ্যত ওয়েটারকে) বাবা, তোমাকে একটু থাকতে হচ্ছে।

মা : (ওয়েটারকে) তোমাকে আটকে রাখার জন্য আমাদের দোষ দিও না। মি. হকের ইচ্ছে।

সৈয়দ : (সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছে) তাতে কিছু ক্ষতি নেই বেগম সাহেবা। কাজের সময় ওকে দেখতে আমার ভালো লাগে। ওর ঐ মাথার মধ্যে শানান বুদ্ধি, দৈত্যের মতো শক্তি নিয়ে কী রকম করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় দেখেও শান্তি।

হক : (আবার শুরু করে) মি. ইয়াজদানী, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে যে অভিযোগ তুলেছেন সেটা কোনো মতেই আপনি উঠিয়ে নিতে রাজি নন ?

ইয়াজ : (মিনতি) আমার দিকটা একবার ভাবুন মি. হক। আমার একলার নয়, গোটা সমাজের দিক থেকে ভাবুন। আমার বোন, আমার ভগ্নিপতি, আমার সমগ্র জ্ঞাতি গোষ্ঠী, বন্ধু, আত্মীয়, তাঁরা কী ভাববে ? নিয়মের বা'র, সমাজের বা'র, দেশের বা'র, এমন একজাতের, মানে, এইরকম—

হক : বুঝতে পারছি।

ইয়াজ : দেখলে ওরা শিউরে উঠবে। ও রকম ছেলেমেয়ে আমাদের সমাজে কোনোদিন মিল খাবে না। এই জন্যই আমার এত দুঃখ। এত কথা বলা।

মা : (চাপা ক্রোধে) ডক্টর খোরশেদ, কিসু আর বেনুর সাজগোজ দেখে তোমার কখনও মনে হয়েছে যে ওরা খেলো, অসভ্য ?

ডাক্তার : কক্ষনো না। যত আজগুবি কথা। বেনুকে ঐ পোশাকে চমৎকার মানায়।

ইয়াজ : তোমার মতো লোকের ওরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা : সৈয়দ, তুমিও অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশেছ। আমার ছেলে-মেয়েদের সাজগোজ কি তোমার খুব অপছন্দ ?

ওয়েটার : কী যে বলেন, বেগম সাহেবা! অপছন্দ হবে কেন। একটু হয়তো নিয়মের বা'র, হয়তো বেশি ঝলমলে, তাই বলে চোখে লাগার মতো কিছুই নয়। রং-এর মিল, পরবার কায়দা, বলবার রীতি, সব মিলে বড় মিষ্টি। ভারি সুন্দর। তাছাড়া পোশাকে কী এসে যায় ? যে কেউ ওদের দেখলে এক নজরে বুঝতে পারবে—

[ঠিক এ সময়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢোকে বেনু। অদ্ভুত তার বেশ। সর্বাঙ্গ ফুলের গহনায় ঢাকা। মুখটাকে বরঞ্চ মনে হয় অনেক বেশি ফুটন্ত ফুলের মাঝখানে একটা মস্তবড় কুঁড়ি। মাথায় পর্যন্ত ফুলের মালায় গড়া মুকুট। আর ফুলের ঠাসবুনট পোশাকের মাঝখান থেকে মাঝে মাঝে জোনাকির মতো জ্বলছে নানা রঙের পাথর।]

বেনু : (ভয়ার্ত চিৎকার করে) বাঁচাও! বাঁচাও! কেউ আমাকে বাঁচাও!

ইয়াজ : (লাফিয়ে দু'হাতে বেনুকে জড়িয়ে আড়াল করে) ভয় কী, এই তো আমি রয়েছি। কী হয়েছে মা ?

['কোথায় গেলি' 'কোথায় গেলি' চিৎকার করতে করতে একহাতে ফুলের ঝুড়ি অন্য হাতে এক বিরাট আঁকশি নিয়ে ঘরে ঢোকে ভীষণাকৃতির কিসু। তার মাথায় পাগড়ি, কানে মাকড়ি, মুখে ইয়া গোঁফ, খালি গা, পরনে ঝালকোঁচা দেওয়া রঙিন ধুতি। কোমরে পট্টি। আজব দেশের দানববংশীয় বাগানের মালির মতো চেহারা।]

কিসু : (ঢুকেই কৃত্রিম ক্রোধে) ওহ্! এই ডালের আড়ালে লুকিয়েছ ? ফুল! উহুম্ রক্ষা নেই। আঁকশির এক খোঁচায় এখনি নামিয়ে দিচ্ছি।

[একটা ভীষণ ভঙ্গি করে আঁকশি বাগিয়ে এগিয়ে আসতেই খল খল করে হেসে ওঠে বেনু। বাহাদুর মালিও ছুঁড়ে ফেলে দেয় তার আঁকশি।]

বেনু : খুব, খুব করেছিস কিসু। ইস্ তোমরা সব এতক্ষণ এখানে বসেছিলে ? নিচে গেলে না কেন ? যা মজা করছিলাম আমরা দুজনে।

[ইয়াজদানী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।]

এ-কী তোমরা আবার চা খাচ্ছিলে নাকি ? মা, আমার চা কোথায় ?

হক : (গমগমে গলায়) ইনিই বোধহয় সেই কনিষ্ঠা কন্যা, না ?

বেনু : (গলার আওয়াজ এবং ভাবে একটু ঘাবড়ে যায়) হ্যাঁ, আপনি কে ?

মা : উনিই মি. ইকরামুল হক, বেনু। তোমার আসাদ মামা যার কথা বলেছিলেন।

বেনু : ওহ্! হক সাহেব ? হক বিচার করতে এসেছেন বুঝি ?

কিসু : শ ষ্ ষ্ ষ্!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াজ : মি. হক! আসাদ মিয়া! এখন তোমরাই বল! আমার আত্মীয়-স্বজনরা যদি সহ্য করতে না পারে তবুও তাদের দোষ দেবে ?

বেনু : ছিঃ, আপনি আবার ও রকম কথাবার্তা শুরু করেছেন ?

ইয়াজ : অ্যাঁ ? যাক! তাহলে আর বলব না। হয়তো তোমাদের সত্যি কোনো দোষ নেই। সব বয়সের দোষ।

বেনু : (নাছোড়বান্দা) বয়সের কথা ছেড়ে দিন। কেমন সাজ করেছি বলুন দেখি ?

ইয়াজ : বেশ। বেশ। উম্ উম্ম্, বেশ হয়েছে।

বেনু : (সন্দেহ হয়) আপনার পছন্দ হয়েছে ?

ইয়াজ : পছন্দ! এ রকম অদ্ভুত সাজগোজ আমি পছন্দ করব বা সমর্থন করব এটা তোমার আশা করা উচিত নয়।

বেনু : তাহলে প্রথমবার বেশ হয়েছে বললেন কেন ? আপনার বিচারে সাজ আমার বেশ হয়েছে অথচ আপনি তা অপছন্দ করেন, একি কখনো হয় ?

আসাদ : (বিরক্ত হয়ে) এ মেয়ে দেখছি একেবারে—

হক : (গভীর মনোযোগ দিয়ে বেনুর কথা শুনছিল। আসাদ মুখ খুলতেই আসাদকে ধমকে উঠে) চুপ করুন। এ মেয়েই ঠিক রাস্তা নিয়েছে। (বেনুকে, গলায় সব আকর্ষণ ঢেলে) দয়া-মমতার কোনো প্রশ্ন নেই। যেমন করে ধরেছ ঠিক ওই রকম করেই এগিয়ে যাও।

বেনু : (হককে) আপনিও বড় মজার লোক। এক ঝলকেই মন জয় করে ফেলছেন। মন্ত্রতন্ত্র জানেন নাকি ?

হক : জানি, তবে কারো কাছে প্রকাশ করি না। (ঘুরে ইয়াজদানীকে) এরা দু'জনেই এখন সামনে রয়েছে। এবার আরো সরাসরি আপনার আসল কথায় আসা যাক। আপনি ভাবছেন আপনার এই দুই কনিষ্ঠ সন্তানদের আপনি আপনার নিজের কাছে রাখবেন। তাহলে আমার কাছ থেকে শুনে রাখুন, আপনি তা করতে পারবেন না, (ইয়াজদানীকে কথার তোড়ে দাবিয়ে) পারবেন না। এখন মনে হচ্ছে পারবেন, কিন্তু আপনার চেয়ে ভালো করে জানি বলেই বলছি, পারবেন না। এই মেয়ের কথাই ধরুন। ওর সকালবেলায় সখ হবে বর্মী মেয়ে সেজে ঘুরে বেড়াতে, বিকেল বেলা সখ হবে ফুলের রানী সাজতে এবং আপনি দুবেলাই চাইবেন বাধা দিতে। আপনি কি মনে করেন ও সেটা মুখ বুজে মেনে নেবে ? কক্ষণো না। এখন হয়তো মুখ বুজে থাকতে পারে, কিন্তু তখন—

বেনু : জি না। আমি তখনো মুখ বুজে থাকব না। (সুদৃঢ়) নিজেকে আমি যত রকমে যতবার খুশি সাজাব। কেউ আপত্তি করলে মানব না, মানব না, মানব না। বর্মায় সেই লোকটাকে রেঙ্গুবু যেমন করে বলেছিল, আমিও ঠিক সেই রকম স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিচ্ছি, মানব না, কোনোদিন না। তৃণে যতদিন প্রাণ আছে, সাগরে যতদিন তরঙ্গ থাকবে, মানব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (পাগলের মতো লাফিয়ে) কী, কী বললে ? কে বলেছিল এ কথা ? রিজিয়া ? কাকে ? কবে ? কোথায় ?

হক : আহ্ ডক্টর! আবার আপনি—

ডাক্তার : থামুন আপনি। আপনি কি বুঝবেন কী হয়েছে! মিস্ রিজিয়া ও কথা কাকে বলেছিল তা আমার জানা দরকার।

বেনু : আমার অত পরিষ্কার করে মনে পড়ছে না। কিসুর হয়তো মনে আছে। কত নম্বর না কিসু ? এটা কী চতুর্থ না পঞ্চম ছিল ?

ডাক্তার : চতুর্থ ? পঞ্চম ?

কিসু : এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন ডাক্তার ? মনে পড়েছে। এ ছিল পাঁচ নম্বর। কিছু না, মামুলি লোক। একেবারে গোবেচারা, নিরীহ গোছের। নৌ-বাহিনীর কাপ্তেন-টাপ্তেন ছিল বোধ হয়।

রিজিয়া : (হিম) মি. হক, এখন আমরা কি নিয়ে আলোচনা করছি ?

ডাক্তার : (মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে) আমাকে ক্ষমা করবেন। এতক্ষণ বাধা দেয়ার জন্যে আমি লজ্জিত। আপনাদের আর কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করব না। নিজেকে আমি আপনাদের মাঝখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাগানেই থাকব। দরকার হলে ডেকে নেবেন।

[ছুটে বেরিয়ে যায়]

বেনু : হুম্! হুম্‌ম্‌ম্!

কিসু : হুম্!

রিজিয়া : আপনি আপনার কাজ শুরু করুন মি. হক।

বেনু : অর্থাৎ একদিক থেকে যত পারেন আমাদের ধমকে যান।

হক : (স্তম্ভিত) আমি ? আশ্চর্য! আমি!

বেনু : অবাক হবার কিছু নেই। ধমকে হুমকি দিয়ে কাজ আদায় করতে আপনি ওস্তাদ। আপনার স্বভাবই ঐ রকম। ভ্রূ কুঁচকানো দেখলেই বোঝা যায়।

হক : মিসেস্ রোকেয়া আহ্‌সান, আপনার ছেলেমেয়েদের আশ্চর্য বুদ্ধি। যে শিক্ষা ওদেরকে এমন সহজ স্বচ্ছ বুদ্ধি দান করেছে আমি মুক্তকণ্ঠে তার প্রশংসা করি। ইচ্ছে করেই এ ঘোষণাটা করে রাখলাম। এবার দয়া করে ওদের কথা বলাটা কিছুক্ষণের জন্য আটকে রাখতে পারেন ?

মা : বেনু মা, ছিঃ!

কিসু : বেনু, আমাদের সেই পুরনো দোষ। কোনো কথা নয়।

[বেনু দু'হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে।]

মা : ওরা আরেকবার শুরু করার আগে তাড়াতাড়ি আরম্ভ করে। ন।

সৈয়দ : আহ! দেরি করছ কেন ? সুযোগ ফসকালে আর মুখ খুলতে পারবে । তাড়াতাড়ি শুরু কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেনু : (উদ্ভাসিত) সকল বিপদের ত্রাণকর্তা স্যার সৈয়দ। (হককে) কী হলো আপনার ?

কিসু : শ্ ষ্ ষ্ ষ্!

হক : (আচমকা বেনুকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে) কোনোদিন বিয়ে করার ইচ্ছে আছে ?

বেনু : কে, আমি ? হায়রে কপাল! আমি যে একজন মহিলা এটা কেউ স্বীকারই করতে চায় না। সবাই মনে করে ছেলেমানুষ। বেনু-বেনু বলে ডাক শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কেবলমাত্র আসাদ মামাই একদিন যথেষ্ট দরদ দিয়ে মিষ্টি করে বলেছিলেন, মিস্ বিলকিস্। কী ভালোই যে লেগেছিল সে ডাক।

আসাদ : অ্যাঁ! সব কিছুরই একটা সীমা থাকা দরকার। (চমকে) আমি ওর মায়ের ভাইর মতো, আর ও কিনা, না, না এ আমি সহ্য করব না।

বেনু : মায়ের ভাইর মতো তো রোজ রোজ বেনু বলে ডাকছিলেন। সেদিন হঠাৎ মিস্ বিলকিস্ বললেন কেন ?

[আসাদ লাফিয়ে প্রায় হুলস্থূল বাঁধিয়ে দেয়]

ইয়াজ : (আসাদকে সামলাতে চেষ্টা করে) এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছ কেন ? শেষে একটা কেলেঙ্কারি করে ছাড়বে দেখছি। মেজাজটাকে একটু বশে রাখতে পারছ না ?

আসাদ : না, এ রকম কাণ্ডের পর মেজাজকে আমি যা খুশি তা করতে দেব। বুড়ো বয়সে আপনার ভীমরতি হয়েছে। নইলে এ রকম অবস্থায় আপনিও চুপ করে বসে থাকতে পারতেন না। আপনার এত অধঃপতন স্বপ্নেও আশা করিনি।

বেনু : মি. হক! দোহাই আপনার, আমাদের সকলের হয়ে আসাদ মামাকে আচ্ছা করে একটু ধমকে দিন তো।

হক : নিশ্চয়ই দেব! মি. আসাদুল্লাহ্ চৌধুরী, নিজেকে যথেষ্ট হাস্যকর করে তুলেছেন। এবার বসে পড়ুন।

আসাদ : তোমাদের কারো—

হক : (গর্জে) মি. আসাদুল্লাহ, কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। আপনি শান্ত হয় বসবেন, না আরো ছেলেমানুষী করবেন ? বসে পড়ুন।

বেনু : (সেও একটু ভড়কে যায়। আস্তে) শুকরিয়া।

হক : সবাই আরেকবার মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। আমি কাজের কথায় আসছি। মিস্ বিলকিস্ যে দিকের ইশারা করেছেন সেদিকে মি. আসাদুল্লাহ্ সত্যি সত্যি কতখানি ঝুঁকেছিলেন, সেটা বিচার করতে আমরা এখানে আসিনি।

[আসাদ কী একটা প্রতিবাদ করতে মুখ খুলেছে। বাধা দিয়ে] আমার কথার মাঝখানে বাধা দেবেন না। মিস্ বিলকিস্ বানু একদিন বিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবেনই এটা জানা কথা। আপনাকে না করে অন্য কাউকে করবেন। এর মধ্যে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হলো এই যে, মিস্ বিলকিস্ বানু যদি বিয়ে করেন, তবে নতুন নামও গ্রহণ করবেন। পিতার নাম গ্রহণ না করার জন্য এই একটা অতি সোজা রাস্তা ওর জন্য খোলা রয়েছে। ওর বড় বোন মিস্ রিজিয়া খানমও বিয়ে করবেন ঠিক করেছেন।

রিজিয়া : (চমকে) মি. হক!

হক : মিথ্যে কিছু বলিনি। হয়তো এখনো মন ঠিক করে উঠতে পারেননি। কিন্তু পারবেন।

রিজিয়া : (ক্রুদ্ধ) চুপ করুন আপনি। আমার নিজের মনের মধ্যে কী আছে না আছে সেগুলো আমি অন্য কারো মুখ থেকে শুনতে চাই না। ভবিষ্যতে এটা ভুলে যাবেন না মি. হক।

হক : (সেয়ানে সেয়ানে) চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে ? হুমকি দিয়ে কাবু করে ফেলবেন, সে জাতের লোক আমি নই। আমার কাছ থেকে আবার শুনে রাখুন, শিগ্‌গির স্বেচ্ছায় আপনি নতুন পদবি গ্রহণ করছেন এবং সেটা আপনার বাবা বা মা কোনো তরফেরই নয়। যদি আরো শুনতে ইচ্ছে করেন, তাহলে সে নামটাও ঘোষণা করে দিতে পারি।

[দাঁড়িয়ে নিজের মুখোশ গুছিয়ে নেয়। সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে।]

যাবার আগে, মি. ইয়াজদানী আপনাকে কিছু স্পষ্ট কথা বলে যাই। এখনো ভালো চান তো আপোসরফা করে ফেলুন। এছাড়া আপনার অন্য গতি নেই। ছেলেমেয়েদের কাছে রাখার আগ্রহ, গোটা পরিবারের মধ্যে আপনারই বেশি। তাই শর্ত ঠিক করার সময় আবার ঠকবেন। আর আপনাকে পাবার আগ্রহটা যদি আপনার পরিবারের দিক থেকেই বেশি প্রকাশ পায় তাহলে এক হাত নিতে পারবেন আপনি। (লম্বা হাতির শুঁড়টা ঠিক করে নেয়) ওদের আসল শক্তি ওদের অদ্ভুত ব্যক্তিগত আকর্ষণে। আপনার পুঁজি আপনার ধন-দৌলত। দুটোরই জোর সমান। এবার আপনারা বসে ফয়সালা করে নিন।

[শুঁড়টা লাগিয়ে দেখে নেয় ঠিক দুলছে কিনা]

বেনু : (হাততালি দিয়ে) কী চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে! এখন বেশ মানুষের মতো দেখাচ্ছে। চলুন আমরা দু'জনে যাই এবার। যাবেন আমার সঙ্গে ?

হক : (মেয়ের মতো গলায়) যাব না কেন ? এলাম বলে। পদ্মবনে মত্তহস্তী!

[বেনু চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে যায়। পেছন পেছন ভয়াবহ গর্জন করে ছুটে যায় মত্তহস্তী।]

কিসু : সৈয়দ!

সৈয়দ : জি!

কিসু : বাবা আর আসাদ মামার জন্য আরো দুটো মুখোশ আর সাজ যোগাড় করা যায় না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ : দেখ ছোক্‌রা— আমি—

ইয়াজ : আহাহা! তুমি আজ কেবল মেজাজ খারাপ করছ। ছেলেমেয়েরা ফুর্তি করতে চাইছে। একদিন ওদের কথা শুনলে তোমার দাম কমে যাবে না।

আসাদ : ইয়াজদানী সাহেব, আজ পঁচিশ বছর ধরে, বলতে হচ্ছে, আপনাকে যা ভেবেছিলাম আপনি তা নন! বাইরেই কেবল হম্বিতম্বি! আপনি যে এতবড় কাপুরুষ তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

[আলাদা হয়ে ঘুরে গিয়ে বসে।]

ইয়াজ : (কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেয়) সব মেনে নিচ্ছি। এখন আর খামকা চটাচটি করে ওদের আনন্দটা মাটি করে দিও না। (ওয়েটারকে) কিছু যোগাড় করতে পারবে আমাদের জন্য ?

সৈয়দ : মুখোশ বোধহয় এখনো কিছু পাওয়া যাবে। একটা লম্বা নাকও দেখে এসেছি, বড় চমৎকার।

আসাদ : নিজের নাক থাকতে আমি আর অন্যের নাক লাগাব না, লাগাব না, লাগাব না।

[ছুটে বেরিয়ে যায়]

সৈয়দ : নিজের নাকের লোকসান না করেও লাগানো যেত হুজুর! আপনারা চলুন, আপনারা চলুন আমার সঙ্গে। পোশাকের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

[এগিয়ে যায়]

ইয়াজ : (এক শিশু আরেক শিশুকে) কিসু, শেষে দেরি না হয়ে যায়।

[দু'জনে জড়াজড়ি করে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে যায়। ওয়েটারও।]

মা : (এতক্ষণে রিজিয়াকে একলা পেয়ে) খোরশেদ হঠাৎ ও রকম করে চলে গেল কেন ?

রিজিয়া : জানি না। না, জানি। সে কথা থাক। চল আমরাও নিচে যাই।

[এগুতেই বাধা পায়। ঘরে ঢোকে খোরশেদ। কালো, বিষণ্ন মুখ]

খোরশেদ : (হিম) ওহ্! মাফ করবেন, আমি মনে করেছিলাম সবাই বুঝি এতক্ষণে চলে গেছে।

রিজিয়া : (খোঁচা দিয়ে) তাই যদি বুঝে থাকবেন, তাহলে আবার ফিরে এলেন কেন ?

ডাক্তার : ফিরে এসেছি পকেটে পয়সা নেই বলে। গেটে এখন টিকেট না দিয়ে বেরুলে সবাই মনে করবে আমি মুখোশের মেলায় ছিলাম অথচ টিকিট করিনি।

মা : তোমাকে মনে হয়েছে কোনো কারণে বিরক্ত হয়েছ। কী হয়েছে ?

রিজিয়া : হবে আবার কী ? উনি এসেছেন আমাকে আরেক প্রস্থ অপমান করার জন্য।

মা : (রিজিয়া গায়ে পড়ে কোন্দল করতে চাইছে এটা বুঝতে পেরে মা অবাক হয়ে যান) রিজিয়া!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (মাকে) আপনি সাক্ষী। বলুন, এমন কিছুই কি আমি করেছি যাতে ওঁর অপমান হতে পারে ?

রিজিয়া : একশ' বার করেছেন। আপনি বোঝাতে চেয়েছেন যে আপনার অতীত আর আমার অতীত একই রকম। এর চেয়ে বড় অপমান আমার জন্য আর কী হতে পারে ?

ডাক্তার : সে রকম কিছুই আমি বোঝাতে চাইনি। তার সব চেয়ে বড় কারণ এই যে, আমার অতীত আপনার অতীত জীবনের তুলনায় অনেক বেশি নির্মল, অনেক শুভ্র!

মা : (ধমকে) খোরশেদ!

ডাক্তার : শুধু আমাকে একলা দোষ দিচ্ছেন কেন ? যখন বুঝতে পারলাম মিস্ রিজিয়া খানম আমার সামনে যেসব কাব্যময় ভাষা ব্যবহার করেছেন, সেগুলো ইতিপূর্বেও একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, তখন আমার মনের অবস্থা কী রকম হলো একবার ভেবে দেখেন। একজন নয়, দু'জন নয়, পাঁচ পাঁচ জন। নৌবাহিনীর কাপ্তেনরা পর্যন্ত এর মধ্যে রয়েছেন। এতদূর স্বপ্নেও ভাবিনি।

মা : ছিঃ ছিঃ, কী সব যা-তা বকছ! তুমি কি মনে কর সত্যি কেউ এতবার হৃদয় দান করতে পারে ? কিসের মধ্যে কী ? হয়তো কিছুই হয়নি। ক্ষণিকের চিত্তভ্রম, হয়তো মুহূর্তের চপলতা। মিছেমিছি এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিলকে তাল করছ।

ডাক্তার : আপনার মেয়ে হয়তো এর ওপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করেনি। কিন্তু তারা ? (হঠাৎ হাস্যকরভাবে আন্তরিক বিষাদভাব ঢেলে) কিন্তু তাদের কথা ভেবে দেখেছেন কখনো ? চূর্ণ হৃৎপিণ্ড নিয়ে যারা অশান্তির ঘর বেঁধেছে, আঘাতের অসহ্য যন্ত্রণা ভোলার জন্য যারা হয়তো আত্মহত্যার দিকে ছুটে গেছে— যারা—

রিজিয়া : মা, এ লোক একটা আস্ত আহাম্মক! একেবারে ফানুস!

মা : (স্তম্ভিত) ছিঃ রেজু! অমন করে মুখ করতে আছে! খোরশেদ কী ভাববে বল তো ?

ডাক্তার : সে আহাম্মকি থেকে আপনিই আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

মা : দেখ খোরশেদ, তুমি পুরুষ মানুষ। নারী জাতির একটা বড় সত্য তোমাকে বলছি। হাতে পায়ে কড়া লাগিয়ে তার কাছ থেকে সারাজীবন মেকি নম্রতা আর বশ্যতা আদায় করা যায়। যে মেয়ে সে মুখোশটাকে নির্মমভাবে ছিঁড়ে ফেলতে না পারে, তার কাছ থেকে কোনোদিনই খাঁটি জিনিসের আশা করো না। আমার রেজুকে ভুল বুঝ না। ও আসলে সত্যি ভালো মেয়ে।

রিজিয়া : অবাক করলে মা! আমারই হয়ে তুমি ওর কাছে সাফাই গাইছ!

মা : রাগ করিস না, রেজু। তোর যে বয়স তার গুণও যেমন অনেক, তেমন দোষও কিছু রয়েছে। আর খোরশেদকেও আমি ভালো করে চিনেছি। জাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষ, আর একটু সেকেলে। মেয়ের মুখ থেকে আহাম্মক গালি শুনলে এখনো সহ্য করতে পারে না। এবার চল সবাই মিলে দেখি বেনু কী কাণ্ড করছে।

রিজিয়া : তুমি যাও মা। ডক্টর খোরশেদের সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা বাকি রয়েছে।

মা : (সনাতন মা) রিজিয়া! (সামলে নিয়ে) না, মানে, নিশ্চয়ই। কথা থাকলে বলবে না কেন? (প্রস্থান)

ডাক্তার : তোমার মতো দশগণ্ডা মেয়ে একত্র করলেও তোমার মায়ের কাছাকাছি হবে না।

রিজিয়া : এই সর্বপ্রথম তোমার মুখ থেকে একটা সত্য কথা বেরুল।

ডাক্তার : বাজে কথা রেখে কী বলতে চাও বলে আমায় বিদায় দাও।

রিজিয়া : বেশ। আমার অনেকদিনের গর্বকে চূর্ণ করে গতকাল বিকেলে মুহূর্তের জন্য তুমি আমাকে তোমার স্তরে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে। ও রকম আকস্মিক মত্ততার কোনোরকম অভিজ্ঞতা যদি আমার থাকত তাহলে আমি আগে থেকেই সাবধান হয়ে যেতাম। তুমি কি মনে কর নিজের এ জাতীয় দুর্বলতার কথা আগে জানা থাকলে আমি নিজেকে বাঁচাতে পারতাম না?

ডাক্তার : (আবেগে থরথর) তুমি কী বকছ নিজেই বুঝতে পারছ না। তোমার ঐ দুর্বলতাই তোমার মূল্য। ঐ দুর্বলতাটুকুর জন্যই আমার এত সাধনা! যে শক্তি ও বুদ্ধির গর্বে মাটিতে তোমার পা পড়ত না তাকে আমি সিকি পয়সাও দামি মনে করিনি। তুমি ভেবেছিলে তোমার উচ্চশিক্ষা আর আধুনিক দুঃসাহসের আড়ালে দাঁড়িয়ে যে-কোনো আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। পারলে না। সেগুলো ওলট-পালট করে দিতে কোনোরকম বেগ পেতে হয়নি আমাকে। বরঞ্চ মনে আনন্দ হয়েছে প্রচুর।

রিজিয়া : (উদ্ধত, কিন্তু পুরুষটি ক্রমশ আয়ত্তাধীনে আসছে সে সম্পর্কে সচেতন) বাহাদুর!

ডাক্তার : কিন্তু করলাম কেন জান! বড় লোভ হয়েছিল তোমার ঐ ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগিয়ে, তোমাকে আগাগোড়া নাড়িয়ে দেবার জন্য। যদি জিজ্ঞেস কর এ রকম লোভ কেন হলো, তারও জবাব আছে। প্রকৃতির সঙ্গে আমি কৌতুক করছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সে আমাকে সাপটে ধরেছে কঠিন বন্ধনে। আর সত্যিই যখন সেই বিস্ময়কর মুহূর্ত আমাদের মাঝখানে এসে দেখা দিল, তখন কার গভীরে তরঙ্গ ভাঙল? সাড়া দিতে পারল কে? জেগে উঠল কে? কার সুপ্ত চেতনার স্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল? তোমার না আমার? আমার। মুহূর্তে নবজন্ম লাভ করলাম আমি। আর তুমি আর্তনাদ করে উঠলে ভয়ে। তোমার সকল উচ্চশিক্ষা নিয়েও তুমি সেই গতানুগতিক অতি সাধারণ মেয়ে। এত গতানুগতিক তোমার সে ভীতি যে নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেনকে পর্যন্ত বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাবার সাহস ছিল না তোমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই। মামুলি ক্ষমাভিক্ষা করে তোমার বিরক্তি এড়াতে চাই না। এবার সত্যি বিদায় নিচ্ছি।

[দরজার দিকে এগুতে থাকে]

রিজিয়া : দাঁড়াও। আমার কথাগুলো বললে বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করবে যে এগুলো তোমার মন ভোলাবার জন্য বলছি না?

ডাক্তার : তুমি কী বলতে চাও, তা আমি জানি। তোমার ধারণা তুমি সাধারণ নও। আমার কথা যে ঠিক, সে কথাই তুমি বলতে চাইছ। আমাকে বোঝাতে চাইছ যে তুমিও জেগেছিলে, নড়েছিলে, ভেঙেছিলে। তোমার মধ্যেও সে ক্ষমতা রয়েছে ভেবে তুমি যত খুশি আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চাও করো, আমি বাধা দেব কেন! (রিজিয়া ফোঁস করে ওঠে) তুমিও যে কোনো কোনো দিক থেকে অসাধারণ এ আমি জানি! যেমন, তোমার অত্যাশ্চর্য বুদ্ধি। অসাধারণ চতুর মেয়ে তুমি! কিন্তু (রিজিয়া চরম ক্ষিপ্ত) কিন্তু তবুও তুমি জাগতে পারলে না কোনোদিন! হয়তো ইচ্ছে করেই জাগতে চাওনি কোনোদিন। হয়তো জাগবার ক্ষমতাই নেই তোমার! আর জান রিজিয়া, তুমি যে জাগলে না এতে তোমার হয়তো কিছুই এসে যাবে না। কিন্তু আমার জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। আমি চলি এবার।

[দরজার দিকে পা বাড়ায়। রিজিয়া একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। আতঙ্কগ্রস্ত চিত্ত নিয়ে দেখে তার শক্ত বাঁধন ছিন্ন করে পুরুষটি কি করে বেরিয়ে পড়ছে। ডক্টর খোরশেদ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তারপর কি মনে করে থেমে পড়ে। ঘুরে রিজিয়ার কাছে আসে।]

এ রকম একটা থমথমে স্তব্ধতার মধ্যে আমাদের শেষ দেখা ঘটুক এ আমি চাই না। হাসিমুখে বিদায় দাও।

রিজিয়া : (তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ভয়ের আর কোনো কারণ নেই। অপূর্ব গ্রীবা-ভঙ্গিমায় অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে) বেশ তো, হাসিমুখে বিদায় দিচ্ছি। কামনা করি, তোমার হৃদয়ের ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে উঠুক।

ডাক্তার : (সেও বুঝতে পারে যে অবস্থা মোটেই গুরুতর নয় এবং সম্পূর্ণ তার আয়ত্তাধীন) আরোগ্য লাভ আমি করবই। এ রোগের প্রকৃতিই এই যে যত না আঘাত করে, তার চেয়ে বেশি উপকার করে। তাছাড়া আমার একান্ত আপন রিজিয়াকেও আর কেউ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

রিজিয়া : (চমকে, ঘুরে) অর্থাৎ?

ডাক্তার : সে রিজিয়া আমার কল্পনার সৃষ্টি।

রিজিয়া : (গরবিনী) তাকে তোমার কাছেই রেখে দাও! তোমার কল্পনার পুতুল তোমার কাছেই থাক। (ক্রমশ মনের ফাটল দিয়ে আবেগ প্রবেশ করে সব কাঠিন্য ভেঙে চুরে দিতে চায়) আর আসল রিজিয়া, যে রিজিয়া শিউরে উঠেছিল, যে রিজিয়া ভয় পেয়েছিল— মিথ্যে বলব কেন, ভয় তো পেয়েইছিলাম যে রিজিয়া জীবনের প্রথম পরীক্ষার মুহূর্তে আবিষ্কার করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে তার সব শিক্ষা, তার গর্ব, শক্তি, সব অর্থহীন, সব ক্ষমতাহীন, দুর্বল, তখন লজ্জায়, ক্ষোভে যে রিজিয়া নিজেকে,— (নিজের মুখচোখ ঢাকবার জন্য রিজিয়া বাঁ হাতের আড়ালে মুখ লুকায়। ডানহাতে শক্ত করে কোনো কুর্সির হাতল ধরে রাখে যাতে পড়ে না যায়।)

ডাক্তার : রিজিয়া, সাবধান! সাবধান হও কিন্তু! আমি আবার আমার সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। (এগিয়ে আসতেই রিজিয়ার মাথা ওর বুকে এলিয়ে পড়ে। একহাতে মাথার চুল এলোমেলো আদর করতে করতে।) রিজিয়া এ ঠিক হচ্ছে না। এ অন্যায় হচ্ছে। এ কিছুতেই হতে পারে না। আমার যে একটা পয়সাও নেই, বিয়ে করে তোমাকে খাওয়াব কী?

রিজিয়া : সবাই যেমন করে পারে। রোজগার করবে।

ডাক্তার : (কিছুটা উল্লসিত, কিছুটা আতঙ্কিত) কিন্তু, কিন্তু, অ্যাঁ, আমি যে কোনোকালেই রোজগার করতে পারিনি। কেন এ অশান্তির মধ্যে পা দিচ্ছ? লোকে আমাকে বলবে টাকার লোভে তোমাকে— (রিজিয়া খোরশেদের অগোছাল চুল হাত দিয়ে, ঠেলে ঠিক করে দেয়, যেন কোনো দুষ্টু শিশুকে শান্ত করছে।) হায় খোদা! (দম আটকে আসে) ওহ্! রিজিয়া! (ধপাস করে বসে পড়ে) আমি একটা মস্ত হাঁদারাম! আজ পর্যন্ত কোনো মেয়েকেই চিনতে পারলাম না। বার বছর ধরে এত রকম দেখলাম, তবু কিছুই শিখলাম না।

[ঈর্ষায় জ্বলে রিজিয়া। ভ্রূ কুঁচকে দেখে। টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে খোরশেদের দিকে। মাকে টানতে টানতে বেনু ঘরে ঢোকে।]

বেনু : ইস্ মা মণি! তুমি যদি দেখতে একবার! আসাদ মামাকে গাধার মুখোশ পরিয়ে কিসু যা একটা কাণ্ড করল! বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বলেও একবার—

মা : ছিঃ ছিঃ তোরা বড্ড বাড়াবাড়ি করিস!

রিজিয়া : (খোরশেদকে ধমকে) বসে রয়েছ কেন ও করম করে, উঠে দাঁড়াতেও পারছ না! (খোরশেদ থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ায়) তোমার ওসব মেকি শালীনতা আর শরাফতগুলো ঝেড়ে ফেলে যা যা হয়েছে সব মাকে সোজাসুজি জানিয়ে দাও। মাকে বলো, আমরা পরস্পরকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি।

[স্তব্ধতা। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। খোরশেদ আতঙ্কে বিবর্ণ, চারিদিকে এমন করে তাকাচ্ছে মনে হয় যেন কোনো দিকে একটু ফাঁক দেখলেই প্রাণ নিয়ে ছুট দেবে।]

বেনু : (প্রথম স্তব্ধতা ভেঙে) কত নম্বর? ছয়?

কিসু : শ ষ্ ষ্ ষ্!

বেনু : (অস্থির) ইস্, কী যে করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার! (ঘরে প্রবেশ করছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসাদ, হাতে মুখোশ) মনের মধ্যে খুশিতে সব লাফালাফি করছে, ইচ্ছে করছে কাউকে খামচে একাকার করে দি!

আসাদ : খবরদার!

[প্রবেশ করে ইয়াজদানী। শাহেনশার পোশাক। জরির কাজ করা তকমা, ঝলমলে পোশাক, মুকুট। পেছন পেছন এগিয়ে এলো, শুঁড় দোলাতে দোলাতে, মি. হক, যেন শাহেনশার বাহন।]

বেনু : বেশ হয়েছে! এই তো বাবা এসেছে। (বাবার গলা জড়িয়ে ধরে) সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে বাবা। শিগ্‌গির এস এদিকে, এ দুটোকে দোয়া কর!

ইয়াজ : (রিজিয়াকে হতাশ দৃষ্টি নিয়ে দেখে) শেষ পর্যন্ত কি এই লোকটাকেই বিয়ে করবে বলে ঠিক করলে, মা?

রিজিয়া : (কঠিন) জি!

ইয়াজ : কিন্তু খোরশেদ! তোমার কাছে অন্তত কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান আশা করেছিলাম।

ডাক্তার : আপনার সে আশা খুবই যুক্তিসঙ্গত। উন্মাদ না হয়ে গেলে এ রকম কাণ্ডে নিজেকে জড়াতে পারতাম না। রিজিয়া, সময় থাকতে এখনো সাবধান হও। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না। যদি চাও তো এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে এমন দূরদেশে চলে যাব যে জীবনে তোমাকে আর আমার ছায়াও মাড়াতে হবে না। আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে, সে জন্য আমি আত্মহত্যাও করব না। তুমি জান না রিজিয়া আমি কী রকম ঘাবড়ে গেছি। ভয়ে আমার দম আটকে আসতে চাইছে।

রিজিয়া : (পাকাপাকি ব্যাপার) না, তুমি যেতে পারবে না।

ডাক্তার : (আর্তনাদ) না, না, লক্ষ্মীটি, অমন অবুঝ হয়ো না। ওহ্, আপনারা কেউ ওকে বুঝিয়ে বলছেন না কেন? ওর বুদ্ধি বিগড়ে গেছে! আপনারা কেউ ওর সুস্থ বুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে পারছেন না? আমার নিজের সে ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মি. হক, মি. হক পারবেন। মি. হক কোথায়?

হক : (পেছন থেকে এগিয়ে এসে, শুঁড় দুলিয়ে) হাজের হ্যায়! (শুঁড় খুলে) কী ব্যাপার? নতুন কোনো সমস্যা?

ডাক্তার : এই যে, এই যে! আপনি এসেছেন, ভালো হয়েছে। দেখুন মি. হক—

আসাদ : মাফ করবেন ডক্টর। আপনি অত উত্তেজিত অবস্থায় ব্যাপারটা মোটেই গুছিয়ে পেশ করতে পারবেন না। আমি সলিসিটর মানুষ, আমাদের পেশাই এটা। দেখুন মি. হক, সমস্যাটা হলো এই তরুণ-তরুণীর বিয়ে নিয়ে। এরা ঠিক করেছে পরস্পরকে বিয়ে করবে। কিন্তু পাত্রীর অবস্থা খুবই ভালো এবং ভবিষ্যতে সেটা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

ইয়াজ : নিশ্চয়ই। আমার সবই ওদের জন্য।

আসাদ : আর অন্যপক্ষে পাত্র একেবারে কপর্দকহীন।

হক : (ডাক্তারকে লক্ষ্য করে) তার জন্য ঘাবড়াবার কী আছে? ডাক্তার, বৌয়ের যেখানে যা পাওনা আছে সব বিয়ের কাবিন নামার সঙ্গেই পাকাপোক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলিলে লিখিয়ে স্বামীর নামে করিয়ে নিন। আপনার নাজুক শরাফত বোধহয় এ প্রস্তাবে একেবারে আঁতকে উঠেছে। স্বাভাবিক। বুদ্ধিমানের মতো আগে থেকে সাবধান হওয়া সকলের ধাতে সয় না। আমার পরামর্শ দেয়ার, দিলাম। রাখা না রাখা আপনার ইচ্ছে। তবে জেনে রাখবেন, কাঁচা কাজে ঠকার ভয় বেশি।

রিজিয়া : আমার সর্বস্ব আমার স্বামীর নামে লেখাপড়া করে দিতে আমি রাজি আছি।

ডাক্তার : (হক-কে) সব ডোবালেন আপনি। হুজুর! আমার নিজের জন্য আপনার কাছে পরামর্শ যদি দিতে পারেন, তাহলে ঐ মেয়েকে সেটা শোনান।

হক : তাতে কোনো লাভ হবে না। এ মেয়ে সেটা গ্রহণ করবে না। এ মেয়ের জাত আলাদা। বিয়ের পর সে আপনার পরামর্শও কোনোদিন গ্রহণ করবে না। (রিজিয়া প্রতিবাদ করতে যায়) না, আপনি করবেন না। এখন মনে হচ্ছে করবেন, কিন্তু তখন করবেন না। তখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করবেন ডাক্তার খোরশেদ। (খোরশেদ প্রতিবাদের জন্য মুখ খোলে) হ্যাঁ, আপনি রোজগার করবেন। এখন ভাবছেন করবেন না, কিন্তু পরে করবেন। স্বেচ্ছায় না করেন, এ মেয়ে আপনাকে বাধ্য করবে!

ইয়াজ : (আধা সম্মতি) অ্যাঁ, তাহলে তো একরকম ভালোই হবে। মি. হক, আপনি যা বললেন তাই যদি হয়, তাহলে এদের বিয়েটা নিছক বোকামি হচ্ছে বলে মনে করতে পারছি না।

হক : কিন্তু আমি তা মনে করি। বৈবাহিক সম্পর্ক মাত্রই এ পৃথিবীতে আহাম্মকি। জন্ম নেয়াটা বোকামি, বেঁচে থাকাটাও বোকামি। হয়তো একমাত্র মরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সৈয়দ : (একটু এগিয়ে এসে) তাই যদি হয়, মাফ করবেন, সে রকম বুদ্ধিমান জাহান্নামে যাক, আহাম্মকিই আমাদের ভালো।

বেনু : ডাক্তার খোরশেদ ফতুর! খতম! অতএব আমাদের যা করণীয় তা হলো বাগানে গিয়ে আতসবাজির রঙিন খেলা দেখা।

হক : জরুর!

ডাক্তার : (রিজিয়াকে) হেরে গেলাম। কী আর করা, চল—

হক : জি না, আমার পরামর্শ বিনা ফি-তে দেওয়া হয় না। সেটা আমি এখন আদায় করব আমার ইচ্ছে মতো। মিস্ রিজিয়া খানম, আপনাকে আমার সঙ্গে বাগানে বেড়াতে হবে।

রিজিয়া : রাজি! (দু'জনে শাহী কায়দায় বেরিয়ে যায়।)

বেনু : আসাদ মামা, আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন!

আসাদ : অসম্ভব! (ছুটে বেরিয়ে যায়। পেছনে বেনু।)

কিসু : মা, তুমি আমি এক সঙ্গে থাকব।

[জড়াজড়ি করে বেরিয়ে যায়। হাসতে হাসতে পেছনে পেছনে ছুটে যায় মি. ইয়াজদানী।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার : (হতাশার প্রতিমূর্তি। ওয়েটারকে) সৈয়দ! আর কী! যবনিকা পড়ুক এবার। বিয়ের ফাঁসিমঞ্চে উঠতে আর তো বেশি দেরি নেই।

ওয়েটার : (নারী-পুরুষের মল্লযুদ্ধে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে গভীর দরদের সঙ্গে দেখে) মন খারাপ করছেন কেন? সময় যখন সত্যি ঘনিয়ে আসে তখন বিয়ের আতঙ্ক সব পুরুষকেই একটু-আধটু ঘায়েল করে। কিন্তু আশ্চর্য এই, পরে অনেক সময়েই দেখা যায় ব্যাপারটা মোটেই অত ভয়ঙ্কর কিছু নয়। এমনকি, মাঝে মাঝে, রীতিমতো আনন্দের এবং সুখের। আপনাকে আর কী বলব, বাড়ির ভেতর কোনোদিনই আমি কর্তা হতে পারিনি। আমার বিবি, ঐ আপনার ওঁর মতোই, শক্ত আওরত ছিল। মায়ের কিছু গুণ ছেলে পেয়েছে। আমার ঠিক উল্টো। তবু যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বলব, সামর্থ্য থাকলে এই জীবনটাই আবার ফিরে চাইতাম। হুবহু যেমন ছিল বারবার করে সেটা বেঁচেও আশা মিটবে না আমার। মানুষের মন বড় আজব। কিসের থেকে যে কী হয়, কেউ কিছু বলতে পারে না। কেউ কিছু বলতে পারে না।

[যবনিকা]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~